আন্‌ নাজ্‌ম

৫৩

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম শব্দ وَالنَّجْمِ থেকে গৃহীত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটিও সূরার শিরোনাম নয়। শুধুমাত্র পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ এ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَوَّلُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةُ النَّجْمُ (সর্ব প্রথম যে সূরাটিতে সিজদার আয়াত নাযিল হয়েছে, সেটি হচ্ছে আন–নাজ্‌ম)। এ হাদীসের যে অংশসমূহ আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু ইসহাক এবং যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া কর্তৃক ইবনে মাসউদের রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, এটি কুরআন মজীদের প্রথম সূরা যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এক সমাবেশে (ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা অনুসারে হারাম শরীফের মধ্যে) শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফের ও ঈমানদার সব শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। অবশেষে তিনি সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করলে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করে। এমনকি মুশরিকদের বড় বড় নেতা যারা তাঁর বিরোধিতার অগ্রভাগে ছিল তারাও সিজদা না করে থাকতে পারেনি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন; আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফকে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছু মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বললো ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে আমি নিজ চোখে তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

এ ঘটনার অপর একজন চাক্ষুষদর্শী হলেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আ। তিনি তখনও মুসলমান হননি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী (সা) সূরা নাজ্‌ম পড়ে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করলো। কিন্তু আমি সিজদা করিনি। বর্তমানে আমি তার ক্ষতিপূরণ করি এভাবে যে, এ সূরা তিলাওয়াতকালে কখনো সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে নবুওয়াতের ৫ম বছরের রজব মাসে সাহাবা কিরামের একটি ছোট্ট দল হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরে ঐ বছর রমযান মাসেই এ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের জনসমাবেশে

সূরা নাজ্‌ম পাঠ করে শোনান এবং এতে কাফের ও ঈমানদার সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। হাবশায় মুহাজিরদের কাছে এ কাহিনী এভাবে পৌঁছে যে, মক্কার কাফেররা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। এ খবর শুনে তাদের মধ্যকার কিছু লোক নবুওয়াতের ৫ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে আসার পর জানতে পারেন যে, জুলুম–নির্যাতন আগের মতই চলছে। অবশেষে হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করার ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে প্রথমবারের হিজরতের তুলনায় অনেক বেশী লোক মক্কা ছেড়ে চলে যায়।

এভাবে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের ৫ম বছরের রমযান মাসে নাযিল হয়েছিলো।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিল হওয়ার সময়–কাল সম্পর্কে এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে কিরূপ পরিস্থিতিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তা জানা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতলাভের শুরু থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বিশেষ বিশেষ বৈঠকেই আল্লাহর বাণী শুনিয়ে মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো কোন জনসমাবেশে কুরআন শোনানোর সুযোগ পাননি। কাফেরদের চরম বিরোধীতাই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রচারণামূলক তৎপরতায় কিরূপ প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে কি সাংঘাতিক প্রভাব আছে তারা তা খুব ভাল করেই জানতো। তাই তাদের চেষ্টা ছিল তারা নিজেরাও এ বাণী শুনবে না অন্য কাউকেও শুনতে দিবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে শুধু নিজেদের মিথ্যা প্রচার প্রোপাগাণ্ডার জোরে তাঁর এ আন্দোলনকে দমিয়ে দেবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিকে তারা বিভিন্ন স্থানে একথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছেন এবং লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অপরদিকে তাদের স্থায়ী কর্মপন্থা ছিল এই যে, নবী *(সা)* যেখানেই কুরআন শোনানোর চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, চিৎকার হৈ হল্লা শুরু করিয়ে দিতে হবে যাতে যে কারণে তাঁকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে জানতে তা যেন লোকে আদৌ জানতে না পারে। এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন পবিত্র হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের একটি বড় সমাবেশে হঠাৎ বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। সূরা নাজম আকারে এখন যে সূরাটি আমাদের সামনে বর্তমান, আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলের *(সা)* মুখে তা বক্তৃতা আকারে পরিবেশিত হলো। এ বাণীর প্রচণ্ড প্রভাবে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তিনি তা শুনাতে আরম্ভ করলে এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের হট্টগোল ও হৈ–হল্লা করার খেয়ালই হলো না। আর শেষের দিকে তিনি যখন সিজদা করলেন তখন তারাও সিজদা করলো। পরে তারা এই ভেবে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলো যে, আমরা একি দুর্বলতা দেখিয়ে ফেললাম। এজন্য লোকজনও তাদেরকে এ বলে তিরস্কার করলো যে, এরা অন্যদের এ বাণী শুনতে নিষেধ করে ঠিকই কিন্তু আজ তারা কান পেতে তা শুধু শুনলো না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সিজদাও করে বসলো। অবশেষে

তারা এ মর্মে মিথ্যা অপবাদ রটায় যে, আরে মিয়া, আমরা তো أَفَرَأَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ কথাটির পর মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترجى (এরা সব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দেবী। তাদের শাফায়াতের আশা অবশ্যই করা যায়) কথাটি শুনেছিলাম। তাই আমরা মনে করেছিলাম যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের পথে ফিরে এসেছে। অথচ তারা যে কথাটি শুনতে পেয়েছে বলে দাবী করেছিলো, এ সমগ্র সূরাটির পূর্বাপর প্রেক্ষিতের মধ্যে তা কোথাও খাটে না। এ ধরনের একটি উদ্ভট বাক্যের সাথে এ সূরার মিল খুঁজে পাওয়া একমাত্র কোন পাগলের পক্ষেই সম্ভব। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল–হাজ্জ, টীকা–৯৬ থেকে ১০১)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার কাফেররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করে চলছিলো তাদের ঐ নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু।

বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন যেমনটি তোমরা রটনা করে বেড়াচ্ছো। আর ইসলামের এ শিক্ষা ও আন্দোলন তিনি নিজে মনগড়া ভাবে প্রচার করছেন না যেমনটা তোমরা মনে করে বসে আছ। বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা নির্ভেজাল অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অহী তাঁর ওপর নাযিল করা হয়। তিনি তোমাদের সামনে যে সব সত্য বর্ণনা করেন তা তাঁর অনুমান ও ধারণা নির্ভর নয়, বরং নিজ চোখে দেখা অকাট্য সত্য। যে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে এ জ্ঞান দেয়া হয় তাকে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাঁকে সরাসরি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করানো হয়েছে। তিনি যা কিছু বলছেন চিন্তা–ভাবনা করে বলছেন না, দেখে বলছেন। যে জিনিস একজন অন্ধ দেখতে পায় না অথচ একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখতে পায়, সে জিনিস নিয়ে চক্ষুষ্মানের সাথে অন্ধের বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেমন, মুহাম্মাদ (সা) এর সাথে তাওহীদ আখেরাত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তোমাদের তর্ক করা ঠিক তেমনি।

এরপর ক্রমান্বয়ে তিনটি বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে ঃ

প্রথমত শ্রোতাদের বুঝানো হয়েছে তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ করছো তা কতকগুলো ধারণা ও মনগড়া জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরা লাত, মানাত ও উয্‌যার মত কয়েকটি দেব–দেবীকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো অথচ প্রকৃত খোদায়ীর ক্ষেত্রে তাদের নাম মাত্রও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ধরে নিয়ে বসে আছ। কিন্তু নিজেদের কন্যা সন্তান থাকাকে তোমরা লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলে মনে কর। তোমরা নিজের পক্ষ থেকে ধরে নিয়েছো যে, তোমাদের এ উপাস্যরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের কাজ আদায় করে দিতে পারে। অথচ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সমস্ত ফেরেশতা সম্মিলিতভাবেও আল্লাহকে তাদের কোন কথা মানতে বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তোমাদের অনুসৃত এ ধরনের আকীদা–বিশ্বাসের কোনটিই কোন জ্ঞান বা দলীল

প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলো নিছক তোমাদের প্রবৃত্তির কিছু কামনা–বাসনা যার কারণে তোমরা কিছু ভিত্তিহীন ধারণাকে বাস্তব ও সত্য মনে করে বসে আছ। এটা একটা মস্ত বড় ভুল। এ ভুলের মধ্যেই তোমরা নিমজ্জিত আছ। সত্যের সাথে যার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে সেটিই প্রকৃত আদর্শ। সত্য মানুষের প্রবৃত্তি ও আকাংখার তাবেদার হয় না যে, সে যাকে সত্য মনে করে বসবে সেটিই সত্য হবে। প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতির জন্য অনুমান ও ধারণা কোন কাজে আসে না। এজন্য দরকার জ্ঞানের। সে জ্ঞানই তোমাদের সামনে পেশ করা হলে তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং উল্টা সে ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করো যে তোমাদের সত্য কথা বলছেন। তোমাদের এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার মূল কারণ হলো, আখেরাতের কোন চিন্তাই তোমাদের নেই। কেবল দুনিয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে আছে। তাই সত্যের জ্ঞান অর্জনের আকাংখা যেমন তোমাদের নেই, তেমনি তোমরা যে আকীদা–বিশ্বাসের অনুসরণ করছো তা সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক তারও কোন পরোয়া তোমাদের নেই।

দ্বিতীয়ত, লোকদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহই সমগ্র বিশ্ব–জাহানের একচ্ছত্র মালিক মোক্তার। যে তাঁর পথ অনুসরণ করছে সে সত্য পথ প্রাপ্ত আর যে তার পথ থেকে বিচ্যুত সে পথ ভ্রষ্ট। পথভ্রষ্ট ব্যক্তির পথভ্রষ্টতা এবং সত্য–পন্থীর সত্য পথ অনুসরণ তাঁর অজানা নয়। তিনি প্রত্যেকের কাজ কর্মকে জানেন। তাঁর কাছে অন্যায়ের প্রতিফলন অকল্যাণ এবং সুকৃতির প্রতিদান কল্যাণ লাভ অনিবার্য ।

তুমি নিজে নিজেকে যা–ই মনে করে থাকো এবং নিজের মুখে নিজের পবিত্রতার যত লম্বা চওড়া দাবিই করো না কেন তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে না। বরং আল্লাহর বিচারে তুমি মুত্তাকী কিনা তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে। তুমি যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে অবস্থান করো তাহলে তাঁর রহমত এত ব্যাপক যে, তিনি ছোট ছোট গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

তৃতীয়ত, কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার শত শত বছর পূর্বে দীনে হকের যে কয়টি মৌলিক বিষয় হযরত ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছিলো তা মানুষের সামনে এজন্য পেশ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সম্পূর্ণ নতুন দীন নিয়ে এসেছেন, বরং মানুষ যাতে জানতে পারে যে, এগুলো মৌলিক সত্য এবং আল্লাহর নবীগণ সব সময় এ সত্যই প্রচার করেছেন। সাথে সাথে ঐসব সহীফা থেকে একথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আদ, সামূদ, নূহ ও লূতের কওমের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল ছিল না। আজ মক্কার কাফেররা যে জুলুম ও সীমালংঘন থেকে বিরত থাকতে কোন অবস্থাতেই রাজি হচ্ছে না, সে একই জুলুম ও সীমালংঘনের অপরাধেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

এসব বিষয় তুলে ধরার পর বক্তৃতার সমাপ্তি টানা হয়েছে এ কথা বলে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় অতি নিকটবর্তী হয়েছে। তা প্রতিরোধ করার মত কেউ নেই। চূড়ান্ত সে মুহূর্তটি আসার পূর্বে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকেও ঠিক তেমনিভাবে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদের সাবধান করা হয়েছিল। এখনি এ কথাগুলোই কি তোমাদের কাছে অভিনব মনে হয়?

এজন্যই কি তা নিয়ে তোমরা ঠাট্টা তামাসা করছো? একারণেই কি তোমরা তা শুনতে চাও না, শোরগোল ও হৈ চৈ করতে থাকো। যাতে অন্য কেউও তা শুনতে না পায়? নিজেদের এ নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমাদের কান্না আসে না? নিজেদের এ আচরণ থেকে বিরত হও, আল্লাহর সামনে নত হও এবং তাঁরই বন্দেগী করো।

এটা ছিল বক্তব্যের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উপসংহার যা শুনে কট্টর বিরোধীরাও নিজেদের সংবরণ করতে পারেনি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণীর এ অংশ পড়ে সিজদা করলে তারাও স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে যায়।

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿১﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿২﴾ وَمَا يَنطِقُ
عَنِ الْهَوَىٰ ﴿৩﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿৪﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿৫﴾
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ﴿৬﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿৭﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿৮﴾
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿৯﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿১০﴾
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿১১﴾ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿১২﴾ وَلَقَدْ رَآهُ
نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿১৩﴾ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴿১৪﴾

তারকারাজির শপথ[১] যখন তা অস্তমিত হলো। তোমাদের বন্ধু[২] পথভ্রষ্ট হয়নি বা বিপথগামীও হয়নি।[৩] সে নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলে না। যা তার কাছে নাযিল করা হয় তা অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪] তাকে মহাশক্তির অধিকারী একজন শিক্ষা দিয়েছে[৫], যে অত্যন্ত জ্ঞানী।[৬] সে সামনে এসে দাঁড়ালো। তখন সে উঁচু দিগন্তে ছিল।[৭] তারপর কাছে এগিয়ে এলো এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে রইলো। অতপর তাদের মাঝে মুখোমুখি দু'টি ধনুকের জ্যা–এর মত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান রইলো।[৮] তখন আল্লাহর বান্দাকে যে অহী পৌঁছানোর ছিল তা সে পৌঁছিয়ে দিল।[৯] দৃষ্টি যা দেখলো মন তার মধ্যে মিথ্যা সংমিশ্রিত করলো না।[১০] যা সে নিজের চোখে দেখেছে তা নিয়ে কি তোমরা তার সাথে ঝগড়া করো?

পুনরায় আর একবার সে তাকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছে।

১. মূল আয়াতে النجم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং সুফিয়ান সাওরী বলেন এর অর্থ সপ্তর্ষিমণ্ডল (Pleiades)। ইবনে জারীর ও যামাখশারী এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আরবী ভাষায় শুধু النجم শব্দ বলা হলে তা দ্বারা সাধারণত সপ্তর্ষিমণ্ডলকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ শুক্রগ্রহ (Venus)।

আবু উবায়দা নাহবীর বক্তব্য হলো, এখানে النَّجْمِ বলে সমস্ত তারকাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বলতে চাওয়া হয়েছে যখন সকাল হলো এবং সমস্ত তারকা অস্তমিত হলো। পরিবেশ ও স্থান–কাল–পাত্রের বিচারে আমাদের কাছে এ শেষ মতটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে صَاحِبُكُمْ (তোমাদের বন্ধু)। আরবী ভাষায় صاحب বলতে বন্ধু, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং সাথে উঠা–বসা করে এমন লোককে বুঝায়। এখানে নবীর (সা) নাম উল্লেখ করা বা "আমার রসূল" বলার পরিবর্তে "তোমাদের বন্ধু" বলে তাঁর কথা উল্লেখ করার মধ্যে অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য আছে। এভাবে কুরাইশদের একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের কাছে যে ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে তিনি তোমাদের এখানে বাইরে থেকে আসা কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন যে, আগে থেকে তোমাদের সাথে তাঁর কোন জানা শোনাই নেই। তিনি তোমাদের নিজ কওমের লোক। তোমাদের মধ্যেই তিনি থাকেন ও বসবাস করেন। তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়, তিনি কেমন চরিত্র ও কর্মের অধিকারী মানুষ, কেমন তাঁর আচার–আচরণ, কেমন তাঁর অভ্যাস ও স্বভাব চরিত্র এবং আজ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে তাঁর জীবন কেমন কেটেছে তা তোমাদের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত জানে। তাঁর সম্পর্কে কেউ যদি নির্লজ্জের মত কিছু বলে তাহলে তাঁকে জানে তোমাদের মধ্যে এমন বহু মানুষ বর্তমান যারা নিজেরাই বিচার করে দেখতে পারে, একথা তাঁর ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় কিনা।

৩. এটিই মূল কথা যার জন্য অস্তমিত তারকা বা তারকারাজির শপথ করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ পথ না চেনার কারণে কারো ভুল পথে চলা এবং বিপথগামী হওয়ার অর্থ জেনে শুনে কারো ভুল পথ অবলম্বন করা। আল্লাহর এ বাণীর তাৎপর্য হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের একান্ত পরিচিত ব্যক্তি। তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে ভুল। প্রকৃতপক্ষে তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী কিছুই হননি। একথা বলতে যে কারণে তারকারাজির অস্তমিত হওয়ার শপথ করা হয়েছে তা হলো, রাতের অন্ধকারে যখন তারকা জ্বল জ্বল করে তখন কোন ব্যক্তি তার চারপাশের বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পায় না এবং বিভিন্ন বস্তুকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে সেগুলো সম্পর্কে ভুল অনুমান করতে পারে। যেমন অন্ধকারে দূরে থেকে কোন গাছ দেখে তাকে ভূত মনে করতে পারে। রশি পড়ে থাকতে দেখে তাকে সাপ মনে করতে পারে। বালুকাস্তূপের কোন পাথর উঁচু হয়ে থাকতে দেখে কোন হিংস্র জন্তু বসে আছে বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যে সময় তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সকালের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন প্রতিটি বস্তু তার মূল আকার–আকৃতিতে মানুষের সামনে প্রকাশ পায়। সে সময় কোন বস্তুর মূল রূপ ও আকার আকৃতির ব্যাপারে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারটাও তাই। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব অন্ধকারে ঢাকা নয়, বরং আলোক উদ্ভাসিত ভোরের মত স্পষ্ট। তোমরা জান, তোমাদের এ "বন্ধু" একজন অতি নম্র স্বভাব, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে কুরাইশদের কোন ব্যক্তির এ ভুল ধারণা কি করে হতে পারে যে, তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তোমরা এও জান যে, তিনি অত্যন্ত সদিচ্ছা পরায়ণ এবং

সত্যবাদী মানুষ। তোমাদের কেউ তাঁর সম্পর্কে কি করে এ মত পোষণ করতে পারে যে, তিনি জেনে শুনে শুধু যে নিজে বাঁকা পথ অবলম্বন করে বসে আছেন তাই নয়, অন্যদেরও সে বাঁকা পথের দিকে আহবান জানাতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

৪. অর্থাৎ যেসব কথার কারণে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো যে, তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয়েছেন সেসব কথা তাঁর মনগড়া নয় কিংবা তাঁর প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা ঐ সবের উৎস নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং হচ্ছে তিনি নিজে নবী হওয়ার আকাংখা করেননি। তাই নিজের আকাংখা পূরণের জন্য নবুওয়াতের দাবী করে বসেছেন এমন নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে যখন তাঁকে এ পদে অভিষিক্ত হতে আদেশ দিলেন তখনই তিনি তোমাদের মাঝে রিসালাতের তাবলীগ তথা প্রচারের জন্য তৎপরতা শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নবী। একইভাবে ইসলামের এ আন্দোলন, তাওহীদের এ শিক্ষা, আখেরাত, হাশর–নাশর এবং কাজকর্মের প্রতিদানের এ খবর মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে এসব সত্য ও তথ্য এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য যেসব নীতিমালা তিনি পেশ করছেন এসবও তাঁর নিজের রচিত দর্শন নয়। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি তোমাদেরকে যে কুরআন শুনিয়ে থাকেন তাও তাঁর নিজের রচিত নয়। এসব আল্লাহর বাণী। এসব বাণী অহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি যে, "তিনি নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলেন না, যা বলেন তা তাঁর কাছে নাযিলকৃত অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।" তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত কোন্ কোন্ কথার সাথে সম্পর্কিত? তিনি যত কথা বলতেন এ উক্তি কি তার সবটার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? নাকি কিছু কিছু কথার ওপর প্রযোজ্য আর কিছু কথার জন্য প্রযোজ্য নয়? এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে তো প্রযোজ্য হবেই। কুরআন মজীদ ছাড়া আরো যেসব কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হতো তাও অনিবার্যরূপে তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

দীনের প্রচার ও আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের জন্য তিনি যেসব কথাবার্তা বলতেন অথবা কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু, তার শিক্ষা এবং আদেশ–নিষেধ ও হিদায়াতসমূহের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ হিসেবে যা কিছু বলতেন অথবা কুরআনেরই উদ্দেশ্য ও দাবী পূরণ করার জন্য যেসব বক্তৃতা করতেন বা লোকদের উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন এগুলো এক শ্রেণীর কথা। এসব কথা সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করার আদৌ কোন অবকাশ নেই যে, তা তিনি (নাউযুবিল্লাহ) মনগড়া ভাবে বলতেন। এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তাঁর মর্যাদা ছিল কুরআনের সরকারী ভাষ্যকার বা মুখপাত্র এবং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে। কুরআনের প্রতিটি শব্দ যেমন নবীর (সা) ওপরে নাযিল করা হতো অনুরূপ এসব কথার প্রতিটি শব্দ যদিও তাঁর ওপর নাযিল করা হতো না কিন্তু তা অবশ্যই তাঁর ওপর নাযিলকৃত ওহীর জ্ঞান ভিত্তিক ছিল। এসব কথা ও কুরআনের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য ছিল যে, কুরআনের ভাষা ও ভাব সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। এসব কথার অর্থ ও ভাব আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের ভাষায় ও শব্দে

তা প্রকাশ করতেন। এ পার্থক্যের কারণে কুরআনকে "অহীয়ে জলী" (প্রকাশ্য অহী) এবং নবীর (সা) অবশিষ্ট এসব কথাবার্তাকে "অহীয়ে খফী" (অপ্রকাশ্য অহী) বলা হয়।

নবীর (সা) দ্বিতীয় আরেক প্রকারের কথাবার্তা ছিল যা তিনি আল্লাহর বিধানের তাবলীগ ও প্রচারণার চেষ্টা সাধনায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার তৎপরতার ক্ষেত্রে বলতেন। এ কাজে তাঁকে মুসলমানদের জামায়াতের নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে বিভিন্ন রকমের অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হতো। এসব ব্যাপারে অনেক সময় তিনি তাঁর সংগী সাথীদের পরামর্শও গ্রহণ করেছেন, নিজের মত বাদ দিয়ে তাদের মতও গ্রহণ করেছেন। তাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে কোন কোন সময় স্পষ্টভাবে বলেছেনও যে, একথা আমি আল্লাহর আদেশে নয়, নিজের মত হিসেবেই বলছি। তাছাড়া অনেকবার এ রকমও হয়েছে যে, তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন কথা বলেছেন কিন্তু পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরিপন্থী নির্দেশনা এসেছে। এ ধরনের যত কথা তিনি বলেছেন তার কোন কথাই আদৌ এমন ছিল না এবং থাকতে পারে না যা তাঁর প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী ও কামনা-বাসনার ফল। এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর এ ধরনের সব কথা কি অহী ভিত্তিক ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হলো, যেসব কথা সম্পর্কে তিনি নিজে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একথা আল্লাহর নির্দেশ ভিত্তিক নয়, কিংবা যে ক্ষেত্রে তিনি সাহাবীদের (রা) পরামর্শ চেয়েছেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেছেন অথবা যেসব ক্ষেত্রে কোন কথা বা কাজ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার পরিপন্থী হিদায়াত নাযিল করেছেন সে কথা ছাড়া তাঁর আর সব কথাই পূর্বোক্ত ধরনের কথাসমূহের মত 'অহীয়ে খফী'র অন্তরভুক্ত। তাই ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও পথ প্রদর্শক, মু'মিনদের দলের সরদার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের যে পদ মর্যাদায় তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তা তাঁর নিজের রচিত বা মানুষের প্রদত্ত ছিল না। তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ কাজ করার জন্য আদিষ্ট ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ পদমর্যাদার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি যা কিছু বলতেন এবং করতেন তা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা নিয়ে করতেন। এ ক্ষেত্রে যেসব কথা তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে বলতেন, তাঁর ঐসব ইজতিহাদের অনেকগুলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। আল্লাহ তাঁকে জ্ঞানের যে আলো দিয়েছিলেন ওগুলো তা থেকে উৎসারিত ছিল। এ কারণে তাঁর ইজতিহাদ যেখানেই আল্লাহর পছন্দের বাইরে চলে গিয়েছে সেখানে তৎক্ষণাৎ "অহীয়ে জলী"র মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোন কোন ইজতিহাদের এ সংশোধনই এ কথা প্রমাণ করে যে, তাঁর অবশিষ্ট সমস্ত ইজতিহাদ হুবহু আল্লাহর মর্জির সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল।

তৃতীয় আরেক রকমের কথা ছিল যা মানুষ হিসেবে নবী (সা) সাধারণ কাজকর্মে বলতেন। নবুওয়াতের দায়-দায়িত্ব পালনের সাথে এসব কথার কোন সম্পর্ক ছিল না। এ ধরনের কথা তিনি নবী হওয়ার পূর্বেও বলতেন এবং নবী হওয়ার পরেও বলতেন। এ ধরনের কথা সম্পর্কে সর্ব প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে, ঐ গুলো নিয়ে কাফেরদের সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। এসব কথার কারণে কাফেররা তাঁকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী বলেনি।

তারা এ অভিযোগ আরোপ করতো প্রথম দুই শ্রেণীর কথার ক্ষেত্রে। তাই এ তৃতীয় প্রকারের কথা আদৌ আলোচ্য বিষয় ছিল না। অতএব আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এ

প্রকারের কথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ঐ প্রকারের কথা এখানে আলোচনা বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এটা বাস্তব যে, জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কখনো সত্যের পরিপন্থী কোন কথা বের হতো না। নবী ও মুত্তাকী সুলভ জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য কথা ও কাজের যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাঁর কথা ও কাজ সদা সর্বদা সে গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। তাই প্রকৃত পক্ষে ঐ সব কথার মধ্যেও অহীর নূর প্রতিফলিত হতো। কোন কোন সহীহ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সময় নবী (সা) বলেছিলেন, لَا أَقُولُ إِلاَّ حَقًّا "আমি কখনো সত্য কথা ছাড়া বলি না।" এক সাহাবী বললেন ঃ فانك تداعبنا يا رسول الله "হে আল্লাহর রসূল, অনেক সময় তো আপনি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টাও করেন।" জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ انى لا اقول الا حقا "প্রকৃতপক্ষে তখনো আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।" মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ আমি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে যা-ই শুনতাম তা সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে লিখে রাখতাম। কুরাইশরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করলো তারা বলতে শুরু করলো, তুমিতো সব কথাই লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছো। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো মানুষ। অনেক সময় রাগান্বিত হয়েও কোন কথা বলেন। এতে আমি লেখা ছেড়ে দিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি এ বিষয়টি নবীর (সা) কাছে বললে তিনি বললেন ঃ

اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى الا الحق .

"তুমি লিখতে থাকো, যাঁর মুঠিতে আমার প্রাণ সে মহান সত্তার শপথ, আমার মুখ থেকে সত্য ছাড়া কখনো কোন কথা উচ্চারিত হয়নি।"

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আমার গ্রন্থ তাফহীমাত, ১ম খণ্ড, শিরোনাম "রিসালাত আওর উসকে আহকাম"। (নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

৫. অর্থাৎ তাঁকে শিক্ষাদানকারী কোন মানুষ নয়, যা তোমরা মনে করে থাকো। মানব সত্তার উর্ধের একটি মাধ্যম থেকে তিনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। "মহাশক্তির অধিকারী" অর্থ কারো কারো মতে আল্লাহর পবিত্র সত্তা। কিন্তু তাফসীরকারদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ব্যাপারে একমত যে, এর অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), কাতাদা, মুজাহিদ এবং রাবী' ইবনে আনাস থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, রাযী, আলূসী প্রমুখ তাফসীরকারগণও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবও তাঁদের অনুবাদে এটিই অনুসরণ করেছেন। সত্য বলতে কি, কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনা থেকেও এটি প্রমাণিত হয়েছে। সূরা তাকভীরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ -

(ايات : ١٩-٢٣)

"প্রকৃতপক্ষে এ এক মহাশক্তিধর সম্মানিত ফেরেশতার বর্ণনা, আরশের অধিপতির কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাঁর আদেশ পালিত হয় এবং সেখানে অত্যন্ত বিশ্বাসী। তোমাদের বন্ধু মোটেই পাগল নন। তিনি সে ফেরেশতাকে আসমানের পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেন।"

যে ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর (সা) হৃদয়–মনে এ শিক্ষা নাযিল করা হয়েছিল সূরা বাকারার ৯৭ আয়াতে সে ফেরেশতার নামও বলে দেয়া হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ

যদি এসব আয়াত সূরা 'নাজ্‌মে'র এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা হয় তাহলে এ ব্যাপারে আদৌ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, মহাশক্তিধর শিক্ষক বলতে যে, আল্লাহ তা'আলাকে নয়, বরং জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ বিষয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কেউ কউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, জিবরাঈলকে কি করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষক বলা যায়। তাহলে তো এর অর্থ দাঁড়াবে তিনি শিক্ষক আর নবী (সা) ছাত্র। এভাবে তো নবীর (সা) তুলনায় জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মর্যাদা অধিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা ভুল। কারণ, জিবরাঈল নবীকে (সা) তাঁর নিজের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন না যে, তাঁর মর্যাদা অধিক হয়ে যাবে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত জ্ঞান পৌঁছিয়ে দেয়ার মাধ্যম বানিয়েছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম বা বাহক হওয়ার কারণে তিনি রূপক অর্থে নবীর (সা) শিক্ষক ছিলেন। এতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন ব্যাপার নেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের সঠিক সময় জানানোর জন্য তাঁকে দু'দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, এবং মুয়াত্তা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন যে, তিনি মুক্তাদী হয়েছিলেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ইমাম হয়ে নামায পড়িয়েছিলেন। এভাবে শুধু শিক্ষার জন্য তাঁকে ইমাম বানানোর অর্থ এ নয় যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীর (সা) চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এটাও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার।

৬. মূল আয়াতে ذُوْمِرَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও কাতাদা একে সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ, হাসান বাসরী, ইবনে যায়েদ এবং সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ এর অর্থ শক্তিশালী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের মতে এর অর্থ

জ্ঞানের অধিকারী। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى এ হাদীসে نومرة শব্দকে তিনি সুস্থ ও সবল অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবী বাক রীতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই জন্য যে, তাঁর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় প্রকার শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এর সবগুলো অর্থ এক সাথে বুঝানোর মত কোন শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। তাই অনুবাদে আমরা এর মধ্য থেকে একটি অর্থকে গ্রহণ করেছি। কারণ, পূর্বের আয়াতাংশেই দৈহিক শক্তির পূর্ণতার উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. দিগন্ত অর্থ আসমানের পূর্ব প্রান্ত যেখানে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূরা তাকভীরের ২৩ আয়াতে একেই পরিষ্কার দিগন্ত বলা হয়েছে। দু'টি আয়াত থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেন তখন তিনি আসমানের পূর্ব প্রান্ত থেকে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য কিছুসংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মূল যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন সে সময় তিনি সে মূল আকৃতিতে ছিলেন। যে সব রেওয়ায়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে পরে আমরা তার সবগুলোই উদ্ধৃত করবো।

৮. অর্থাৎ আসমানের পূর্ব দিগন্তের উপরের দিকে আবির্ভূত হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং অগ্রসর হতে হতে তাঁর কাছে এসে উপর দিকে শূন্যে ঝুলে থাকলেন। এরপর তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এতটা নিকটবর্তী হলেন যে, তাঁর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কেবল মুখোমুখি দু'টি ধনুকের জ্যা পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও কিছু কম ব্যবধান রইলো। সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ قاب قوسين অর্থ দুই ধনুক পরিমাণই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) قوس শব্দের অর্থ করেছেন হাত এবং كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থ করেছেন এই যে, উভয়ের মাঝে তখন দুই হাত পরিমাণ ব্যবধাণ ছিল। মুখোমুখি লাগানো দু'টি ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান ছিল বলার অর্থ এ নয় যে, দূরত্বের পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন সন্দেহ হয়েছে, (নাউযুবিল্লাহ)। এ ধরনের বাচনভঙ্গি গ্রহণের কারণ হলো সব ধনুক একই পরিমাপের হয় না। সুতরাং ঐ হিসেব অনুসারে যদি কোন দূরত্ব বর্ণনা করা হয় তাহলে দূরত্বের পরিমাণে অবশ্যই কম বেশী হবে।

৯. মূল আয়াত হচ্ছে, فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى । এ আয়াতাংশটির দু'টি অনুবাদ সম্ভব। একটি হচ্ছে, তিনি আল্লাহর বান্দার প্রতি যা কিছু অহী নাযিল করার ছিল, তা করলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি অহী করলেন নিজের বান্দার ওপর যা কিছু অহী করার ছিল। প্রথম অনুবাদ করা হলে তার অর্থ হবে জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাকে অর্থাৎ রসূল (সা)–কে অহী দিলেন যা তাঁকে অহী দেয়ার ছিল। দ্বিতীয় অনুবাদটি করলে তার অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাহকে অহী দিলেন যা অহী দেয়ার ছিল। তাফসীরকারগণ এ দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথম অর্থটাই পূর্বাপর বিষয়ের

সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। হযরত হাসান বাসরী এবং ইবনে যায়েদ থেকে এ অর্থটাই বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, عبده শব্দের ه সর্বনাম اوحى ক্রিয়ার কর্তার প্রতি ইংগিত করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি কিভাবে ইংগিত করবে? কারণ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোথাও আদৌ আল্লাহর নাম উল্লেখিত হয়নি। এর জবাব হলো, যেখানে বক্তব্যের পূর্ব প্রসংগ দ্বারা সর্বনামের উদ্দিষ্ট বিশেষ ব্যক্তির প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় সেখানে পূর্বে উল্লেখ করা হোক বা না হোক সর্বনাম দ্বারা আপনা থেকেই সে ব্যক্তিকে বুঝাবে। কুরআন মজীদে এর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ "আমি কদরের রাতে তা নাযিল করেছি।" এখানে কোথাও কুরআনের উল্লেখ মোটেই করা হয়নি। কিন্তু বক্তব্য থেকে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, ه সর্বনাম দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে :

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

"আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে শুরু করেন তাহলে তার পৃষ্ঠে জীবন্ত কিছুই রাখবেন না"

এখানে আগে বা পরে পৃথিবীর কোন উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কথার ধরন থেকে আপনিই প্রকাশ পায় যে, তার পৃষ্ঠ অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ "আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেইনি। আর কবিতা তার জন্য শোভাও পায় না। এখানে পূর্বে বা পরে কোথাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু কথার ধরন থেকে প্রকাশ পায় যে, সর্বনামগুলো তাঁর প্রতি ইংগিত করেছে। সূরা আর-রাহমানে বলা হয়েছে : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ "তার ওপরে যা আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।" এখানে আগে ও পরে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় عَلَيْهَا এর সর্বনাম هَا দ্বারা সেদিনকেই ইংগিত করা হয়েছে।

সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে : اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করবো। আশে পাশে এমন কোন বস্তু নেই যার প্রতি هُنَّ শব্দটি দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কথার ভঙ্গি থেকে প্রকাশ পায় যে, এর দ্বারা জান্নাতের নারীদের বুঝানো হয়েছে। জিবরাঈল নিজের বান্দাকে অহী দিলেন اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ আয়াতাংশের অর্থ যেহেতু এরকম হতে পারে না। তাই "জিবরাঈল (আ) আল্লাহর বান্দাকে অহী দিলেন কিংবা আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাকে অহী দিলেন" অনিবার্যরূপে এ অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

১০. অর্থাৎ দিনের আলোতে, পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এবং খোলা চোখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখলেন সে সম্পর্কে তাঁর মন বলেনি যে, এসব দৃষ্টিভ্রম কিংবা আমি কোন জিন বা শয়তান দেখছি কিংবা আমার সামনে কোন কাল্পনিক ছবি ভেসে উঠেছে এবং জেগে জেগেই কোন স্বপ্ন দেখছি। বরং তাঁর চোখ যা দেখছিলো মন হুবহু তাই বিশ্বাস করেছে। তিনি যে সত্যিই সত্যিই জিবরাঈল এবং যে বাণী তিনি পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলেন তাও বাস্তবে আল্লাহর অহী সে ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহই জাগেনি।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কি কারণে এ বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে আদৌ কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলো না এবং তিনি পূর্ণ নিশ্চয়তা সহ জানতে পারলেন যে, তাঁর চোখ যা দেখছে তা প্রকৃতপক্ষেই সত্য ও বাস্তব, কোন কাল্পনিক বস্তু বা কোন জিন কিংবা শয়তান নয়? এ প্রশ্ন নিয়ে আমরা যখন গভীরভাবে চিন্তা করি তখন পাঁচটি কারণ আমাদের বোধগম্য হয়।

প্রথম কারণ, যে পারিপার্শিক অবস্থা ও পরিবেশে দেখার কাজটি সংঘটিত হয়েছিল সেটাই তার সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে দেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারে মুরাকাবারত অবস্থায় স্বপ্নে কিংবা অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় এ দর্শন লাভ করেছিলেন না, বরং তখন সকালের পরিষ্কার আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত ছিল, তিনি পুরোপুরি জাগ্রত ছিলেন, খোলা আকাশে এবং দিনের পূর্ণ আলোতে তিনি নিজ চোখে ঠিক তেমনিভাবে এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলেন যেমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস দেখে থাকে। এতে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে আমরা দিনের বেলা নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মানুষ, ঘরবাড়ী, মোট কথা যা কিছু দেখে থাকি তা সবই সন্দেহ যুক্ত এবং শুধু দৃষ্টিভ্রম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানসিক অবস্থাও এর সত্যতার স্বপক্ষে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করছিলো। তিনি পূর্ণরূপে স্বজ্ঞান ও সুস্থ ছিলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ সুস্থ ও সচল ছিল। তাঁর মন-মগজে পূর্ব থেকে এরূপ কোন খেয়াল চেপে ছিল না যে, এ ধরনের কোন দর্শন লাভ হওয়া উচিত বা হতে যাচ্ছে। এরূপ চিন্তা এবং তা অর্জন করার চেষ্টা থেকে মন-মগজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। এ পরিস্থিতিতে তিনি আকস্মিকভাবে এ ঘটনার মুখোমুখি হলেন। তাই সন্দেহ করার আদৌ কোন অবকাশ ছিল না যে, চোখ কোন বাস্তব দৃশ্য দেখছে না, বরং সামনে এসে দাঁড়ানো একটি কাল্পনিক বস্তু দেখছে।

তৃতীয় কারণ, এ পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে যে সত্তা আবির্ভূত হয়েছিল তা এত বিরাট, এত জাঁকালো, এত সুন্দর এবং এতই আলোকোদ্ভাসিত ছিল যে, ইতিপূর্বে নবীর (সা) চিন্তায় ও ধ্যান-ধারণায় এরূপ সত্তার কল্পিত রূপও আসেনি। সুতরাং তা তাঁর কল্পনা প্রসূতও ছিল না। কোন জিন বা শয়তান এমন জাঁকালো হতে পারে না। তাই তিনি তাকে ফেরেশতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সে সময় আমি জিবরাঈলকে দেখেছি, তাঁর তখন ছয়শত ডানা ছিল (মুসনাদে আহমদ)। অপর একটি বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামের এক একটি ডানা এমন বিশাল ছিল যে, গোটা দিগন্ত জুড়ে আছে বলে মনে হচ্ছিল (মুসনাদে আহমদ)। আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁর অবস্থাকে شَدِيْدُ الْقُوٰى এবং ذُوْمِرَّةٍ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করছেন।

চতুর্থ কারণ, সে সত্তা যেসব শিক্ষা দান করছিলেন তাও এ সাক্ষাতের সত্যতা সম্পর্কে প্রশান্তিদায়ক ছিল। তাঁর মাধ্যমে তিনি হঠাৎ যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গোটা মহাবিশ্বের প্রকৃত সত্য ও তাৎপর্যের ধারক যেসব জ্ঞান লাভ করলেন তাঁর মন-মগজে সে সম্পর্কে কোন ধারণাও ছিল না। তাই তিনি সন্দেহ করেননি যে, আমারই ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা সুবিন্যস্ত হয়ে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ জ্ঞান সম্পর্কে

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾ اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾

যার সন্নিকটেই জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত।[১১] সে সময় সিদরাকে আচ্ছাদিত করছিলো এক আচ্ছাদনকারী জিনিস।[১২] দৃষ্টি ঝলসেও যায়নি কিংবা সীমা অতিক্রমও করেনি।[১৩] সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছে।[১৪]

এখন একটু বলতো, তোমরা কি কখনো এ লাত, এ উয্‌যা এবং তৃতীয় আরো একজন দেবতা মানা'তের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা–ভাবনা করে দেখেছো?[১৫] তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহর জন্য?[১৬] তাহলে এটা অত্যন্ত প্রতারণামূলক বন্টন। প্রকৃতপক্ষে এসব তোমাদের বাপ দাদাদের রাখা নাম ছাড়া আর কিছুই না। এজন্য আল্লাহ কোন সনদপত্র নাযিল করেন নি।[১৭] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মানুষ শুধু ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনার দাস হয়ে আছে।[১৮] অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হিদায়াত এসেছে।[১৯] মানুষ যা চায় তাই কি তার জন্য ঠিক?[২০] দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ।

এমন সন্দেহ পোষণেরও কোন অবকাশ ছিল না যে, শয়তান ঐ আকৃতিতে এসে তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে। কারণ, মানুষকে শির্‌ক ও মূর্তিপূজার পরিবর্তে নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা দেয়া কি কখনো শয়তানের কাজ হতে পারে, না শয়তান কোনদিন এমন কাজ করেছে? আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে কি শয়তান কখনো মানুষকে সাবধান করেছে? জাহেলিয়াত ও তার রীতিনীতির বিরুদ্ধে কি মানুষকে কখনো ক্ষেপিয়ে তুলেছে? নৈতিক গুণাবলীর প্রতি কি আহবান জানিয়েছে? নাকি কোন ব্যক্তিকে বলেছে, তুমি নিজে শুধু এ

শিক্ষাকে গ্রহণ কর তাই নয়, বরং গোটা বিশ্বের বুক থেকে শিরক, জুলুম এবং পাপ পঙ্কিলতাকে উৎখাত এবং ঐসব দুষ্কৃতির জায়গায় তাওহীদ, ন্যায়বিচার এবং তাকওয়ার সুফলসমূহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও?

পঞ্চম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তিকে নবুওয়াত দানের জন্য বাছাই করেন তখন তাঁর হৃদয়–মনকে সব রকম সন্দেহ সংশয় ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় দ্বারা পূর্ণ করে দেন। এ অবস্থায় তাঁর চোখ যা দেখে এবং কান যা শোনে তার সত্যতা সম্পর্কে তাঁর মন–মগজে সামান্যতম দ্বিধা–দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয় না। তিনি সম্পূর্ণ উদার ও উন্মুক্ত মনে এমন প্রতিটি সত্যকে গ্রহণ করে নেন যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করা হয়। তা চোখে দেখার মত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হতে পারে, ইল্‌হামী জ্ঞান হিসেবে তাঁর মনে সৃষ্টি করা হতে পারে কিংবা অহীর পয়গাম হিসেবে আসতে পারে একটি একটি করে যার প্রতিটি শব্দ শুনানো হয়ে থাকে। এর সবক'টি ক্ষেত্রেই নবীর এ উপলব্ধি পুরোপুরিই থাকে যে, তিনি সব রকম শয়তানী হস্তক্ষেপ থেকে চূড়ান্তভাবে সুরক্ষিত। যে আকারেই হোক না কেন যা কিছু তাঁর কাছে পৌঁছছে তা অবিকল তাঁর প্রভুর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত অনুগ্রহ ও নিয়ামতের মত নবীর এ উপলব্ধি ও অনুভূতিও এমন একটি নিশ্চিত জিনিস যার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। মাছের যেমন তার সাঁতারু হওয়া সম্পর্কে পাখির যেমন তার পাখি হওয়া সম্পর্কে এবং মানুষের যেমন তার মানুষ হওয়া সম্পর্কে অনুভূতি আছে এবং তা আল্লাহ প্রদত্ত। এতে যেমন বিভ্রান্তির লেশমাত্র থাকতে পারে না। অনুরূপ নবীর তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে যে অনুভূতি তাও আল্লাহ প্রদত্ত হয়ে থাকে। কখনো এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে এ সন্দেহ জাগে না যে, নবী হওয়ার ব্যাপারে হয়তো সে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

১১. এটা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয়বারের মত সাক্ষাত। এ সাক্ষাতকারের সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীর (সা) সামনে তাঁর আসল চেহারায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ সাক্ষাৎকারের স্থান বলা হয়েছে سدرة المنتهى । সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তার নিকটেই "জান্নাতুল মা'ওয়া" অবস্থিত।

আরবীতে 'সিদরা' বলা হয় বরই গাছকে আর 'মুনতাহা' অর্থ শেষ প্রান্ত সুতরাং سدرة المنتهى–এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শেষ প্রান্তে অবস্থিত বরই–গাছ। আল্লামা আলূসী "রুহুল মাআনী"তে এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ اليها ينتهى علم كل عالم وما وراء ها لا يعلمه الا الله "এ পর্যন্ত গিয়ে সব জ্ঞানীর জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। এর পরে যা আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।" ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে এবং ইবনে আসীর" النهاية فى غريب الحديث والاثر এও প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তু জগতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সে কুল বৃক্ষ কেমন এবং তার প্রকৃতি ও পরিচয় কি তা জানা আমাদের জন্য কঠিন। এটা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মহাবিশ্বের এমন রহস্যাবৃত বিষয় যেখানে আমাদের বোধ ও উপলব্ধি পৌঁছতে অক্ষম। যাই হোক, সেটা হয়তো এমন কোন জিনিস যা বুঝানোর মানুষের ভাষায় سدرة শব্দের চেয়ে অধিক উপযুক্ত শব্দ আল্লাহ তা'আলা আর কোন কিছুকে মনে করেননি।

"জান্নাতুল মা'ওয়া"র আভিধানিক অর্থ এমন জান্নাত যা অবস্থান স্থল হতে পারে। হযরত হাসান বাসরী বলেন ঃ এটা সেই জান্নাত যা আখেরাতে ঈমানদার ও তাকওয়ার অধিকারী লোকেরা লাভ করবে। এ আয়াত দ্বারাই তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এ জান্নাত আসমানে অবস্থিত। কাতাদা (রা) বলেন ঃ এটাই সে জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহসমূহ রাখা হয়। আখেরাতে যে জান্নাত পাওয়া যাবে এটা সে জান্নাত নয়। ইবনে আব্বাসও (রা) একথাই বলেন। তিনি অধিক এতটুকু বলেছেন যে, আখেরাতে ঈমানদারগণ যে জান্নাত লাভ করবেন এটা সে জান্নাত নয়। সে জান্নাতের স্থান এ পৃথিবীতেই।

১২. অর্থাৎ তার অবস্থাও প্রকৃত বর্ণনার অতীত। সেটা ছিল এমন আলোকোচ্ছটা মানুষ যার কল্পনাও করতো না এবং মানুষের কোন ভাষা তার বর্ণনা দিতেও সক্ষম নয়।

১৩. অর্থাৎ একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম সহ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার অবস্থা ছিল এই যে, এ ধরনের সাংঘাতিক আলোকোচ্ছটার সামনেও তাঁর দৃষ্টি কোন রকম ঝলসে যায়নি। তিনি পূর্ণ প্রশান্তিসহ ঐ সব দেখেছেন। অপরদিকে তাঁর সংযম ও একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা ছিল এই যে, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়েছিল সেদিকেই তিনি তাঁর মন-মগজ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। যেসব বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী সেখানে ছিল তা দেখার জন্য তিনি একজন কৌতূহলী ও বিমুগ্ধ দর্শকের মত এদিক সেদিক দৃষ্টি দেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন ব্যক্তি কোন পরাক্রমশালী বাদশাহর দরবারে যাওয়ার সুযোগ লাভ করলো এবং সেখানে সে এমন জাঁকজমকপূর্ণ কিছু জিনিস দেখতে পেল যা সে কোন দিন কল্পনার চোখ দিয়েও দেখেনি। লোকটি যদি নীচাশয় হয় তাহলে সেখানে গিয়ে সে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং দরবারের আদব কায়দা সম্পর্কে যদি অজ্ঞ হয় তাহলে শাহী মর্যাদা সম্পর্কে অমনযোগী হয়ে দরবারের সাজ সজ্জা দেখার জন্য সবদিকে ঘুরে ঘুরে তাকাতে থাকবে। কিন্তু একজন উঁচুমনা ও বুদ্ধিমান, রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সচেতন এবং কর্তব্য পরায়ণ কোন ব্যক্তি সেখানে গিয়ে হতভম্ব হবে না এবং দরবারের দৃশ্য দেখার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। সে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেখানে হাজির হবে। যে উদ্দেশ্যে তাকে দরবারে ডাকা হয়েছে সেদিকে মনোনিবেশ করবে। এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণটির প্রশংসা করা হয়েছে।

১৪. এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি কেবল তার বিশাল ও বিপুল নিদর্শনাদি দেখেছেন। যেহেতু পূর্বাপর প্রসংগের বিচারে দ্বিতীয় বারও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে সত্তার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল যার সাথে প্রথম বার সাক্ষাত ঘটেছিল। তাই অনিবার্যরূপে একথা মানতে হবে যে, প্রথমবার তিনি উঁচু দিগন্তে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না এবং দ্বিতীয়বার سدرة المنتهى'র কাছে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না। এ দু'টি ক্ষেত্রের কোন একটিতেও যদি তিনি আল্লাহকে দেখতেন তাহলে তা হতো এমন একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার যা অবশ্যই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হতো। হযরত মূসা সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখার প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে জবাব দেয়া হয়েছিল

لن ترانى "তুমি আমাকে দেখতে পারবে না" (আল–আ'রাফ–১৪৩)। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, হযরত মূসাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়নি তা যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হতো তাহলে তা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হতো। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়নি, নবী (সা) তাঁর রবকে দেখেছিলেন। পক্ষান্তরে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে সূরা বনী ইসরাঈলেও বলা হয়েছে, আমি আমার বান্দাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এজন্য যে, তাকে আমার নিদর্শনাদী দেখাবো" (لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا) আর 'সিদরাতুল মুনতাহায়' যাওয়া প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন,

(لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى)

এসব কারণে বাহ্যত এ বিতর্কের কোন প্রয়োজনই ছিল না যে, এ দু'টি ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন, না জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন? কিন্তু যে কারণে এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ আমরা নিচে এক এক করে বর্ণনা করলাম।

এক ঃ হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

হাদীস গ্রন্থ বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে হযরত মাসরূক থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম; "আম্মাজান, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন। "তোমার একথা শুনে আমার গায়ের পশম শিউরে উঠেছে। তুমি কি করে ভুলে গেলে যে, তিনটি বিষয় এমন যা কেউ দাবী করলে মিথ্যা দাবী করা হবে।" (তার মধ্যে প্রথম কথাটি হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা হচ্ছে) "কেউ যদি তোমাকে বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছিলেন, তাহলে সে মিথ্যা বলে।" তারপর হযরত আয়েশা (রা) এ আয়াতগুলো পাঠ করলেন। لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ –

"কোন মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তবে হয় অহী হিসেবে বা পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং সে তাঁর ইচ্ছা মাফিক তার প্রতি অহী নাযিল করবে।" এরপর তিনি বললেনঃ "তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দু'বার তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন।"

এ হাদীসের একটি অংশ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদের ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বাদ্‌উল খালক্ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী মাসরূক বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে মাসরূক (রা) বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশার একথা শুনে আমি বললাম তাহলে

আল্লাহ তা'আলার একথার কি অর্থ হবে? ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى? তিনি বললেন এর দ্বারা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি সব সময় মানুষের রূপ ধরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতেন। কিন্তু ঐ সময় তিনি তাঁর আসল আকৃতিতে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর শরীরে গোটা দিগন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম কিতাবুল ঈমানের باب فى ذكر سدرة المنتهى এ হযরত আয়েশার (রা) সাথে মাসরূকের এ কথোপকথন অধিক বিস্তারিত রূপে উদ্ধৃত হয়েছে। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছেঃ হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি দাবী করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অতি বড় অপবাদ আরোপ করে। "মাসরূক বলেন ঃ আমি হেলান দিয়ে বসেছিলাম। একথা শুনে আমি উঠে বসলাম এবং বললাম; উম্মুল মু'মিনীন তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ? জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ এ উম্মতের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

انما هو جبريل عليه السلام ، لم اره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين - رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض -

তিনি তো ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সে আসল আকৃতিতে আমি তাঁকে এ দু'বার ছাড়া আর কখনো দেখিনি। দু'বারই আমি তাঁকে আসমান থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সে সময় তাঁর বিশাল সত্তা পৃথিবী ও আসমানের মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্যলোক ছেয়ে ফেলেছিলো।"

মাসরূক বর্ণিত এ হাদীস ইবনে মারদুইয়া যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমিই সর্ব প্রথম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? জবাবে নবী (সা) বললেন, না। "আমি তো জিবরাঈলকে আসমান থেকে নেমে আসতে দেখেছিলাম।"

দুই ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ বুখারী কিতাবুত তাফসীর, মুসলিম কিতাবুল ঈমান এবং তিরমিযী আবওয়াবুত তাফসীরে যির ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে এমন আকৃতিতে দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শত ডানা ছিল।

মুসলিমের অন্যান্য রেওয়ায়াতে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى এবং لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى আয়াতেরও এ একই তাফসীর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন ঃ

মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ তাফসীর যির ইবনে হুবাইশ ছাড়া আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ এবং আবু ওয়ায়েলের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও মুসনাদে আহমদে যির ইবনে হুবাইশের আরো দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি জিবরাঈলকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছি। সে সময় তাঁর ছয়শত ডানা ছিল।"

এ একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস শাকীক ইবনে সালামা থেকে ইমাম আহমদও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মুখ থেকে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছিলেনঃ আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে এ আকৃতিতে "সিদরাতুল মুনতাহায়" দেখেছিলাম।

তিনঃ আতা ইবনে আবী রাবাহ হযরত আবু হুরাইরাকে (রা) لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ راى جبريل عليه السلام নবী (সা) জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

চার ঃ ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে হযরত আবু যার গিফারীর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বর্ণিত দু'টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এক রেওয়ায়াতে তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ । অপর রেওয়ায়াতে বলেছেন ঃ তিনি আমার এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন ঃ رَاَيْتُ نُوْرًا । ইবনুল কাইয়েম زاد المعاد গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম উক্তির অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন আমার ও আল্লাহকে দেখার মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল নূর। তিনি দ্বিতীয় উক্তির অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, আমি আমার রবকে দেখিনি, বরং নূর দেখেছি।"

নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেম নিম্নোক্ত ভাষায় হযরত আবু যারের (রা) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তর দিয়ে তাঁর রবকে দেখেছেন, চোখ দিয়ে দেখেন নি।"

পাঁচ ঃ ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ما انتهى اليه بصر من خلقه "আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্য থেকে কারো চোখই আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌছেনি।"

ছয় ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى – وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াত দু'টির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দু'বার অন্তর দিয়ে দেখেছেন। মুসনাদে আহমদেও এ হাদীসটি আছে।

আতা ইবনে আবী রাবাহ্‌র বরাত দিয়ে ইবনে মারদুইয়াহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে চোখ দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে দেখেছিলেন।

নাসায়ীতে ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ

اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والروية لمحمد؟

"আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দর্শনলাভের মর্যাদা দিয়েছেন" এতে কি তোমরা বিস্ময়বোধ করছো ? হাকেমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযীতে শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস এক মজলিসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাক্ষাতলাভ ও কথোপকথনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে দু'বার কথা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দু'বার দেখেছেন।" ইবনে আব্বাসের এ কথা শুনে মাসরূক হযরত আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? "তিনি বললেন ঃ তুমি এমন কথা বলেছো যা শুনে আমার পশম শিউরে উঠেছে।" এর পর হযরত আয়েশা ও মাসরূকের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে আমরা তা উপরে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে উদ্ধৃত করেছি।

তিরমিযীতেই অন্য যেসব হাদীস ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তার একটিতে তিনি বলেছেন, নবী (সা) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় একটি হাদীসে বলেছেন; দু'বার দেখেছিলেন এবং তৃতীয় আরেকটি হাদীসে বলেছেন, তিনি অন্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন।"

মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربى تبارك وتعالى "আমি আমার মহাকল্যাণময় ও মর্যাদাবান রবকে দেখেছি।" আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى الليلة فى احسن صورة ، احسبه يعنى فى النوم –

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার রব আজ রাতে অতীব সুন্দর আকৃতিতে আমার কাছে এসেছিলেন। আমার মনে হয় নবীর (সা) এ কথার অর্থ তিনি স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন।"

তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়াহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসে এও উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'বার তাঁর রবকে দেখেছেন। একবার দেখেছেন চোখে আরেকবার দেখেছেন অন্তর দিয়ে।

সাত ঃ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ আমি তাঁকে দু'বার অন্তর দিয়ে দেখেছি (ইবনে আবী হাতেম)। এ বর্ণনাটিকে ইবনে জারীর যেরূপ ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে, নবী (সা) বললেন ঃ "আমি তাঁকে চোখ দিয়ে অন্তর দিয়ে দু'বার দেখেছি।"

আট ঃ মি'রাজের ঘটনা প্রসংগে শারীক ইবনে আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে ইমাম বুখারী কিতাবুত তাওহীদে হযরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে এ কথাগুলো আছে ঃ

حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله فيما اوحى اليه خمسين صلوة –

"তিনি যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন তখন মহাপরাক্রান্ত ও মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং তার উপর দিকে শূন্যে অবস্থান করলেন। এমন কি নবী (সা) ও তাঁর মধ্যে মুখোমুখি দু'টি ধনুকের মধ্যকার সমান বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইলো। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে যেসব বিষয়ে অহী করলেন তার মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশও ছিল।"

কিন্তু এ হাদীসের সনদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী, হাফেজ ইবনে হাজার, ইবনে হাযম এবং الجمع بين الصحيحين প্রণেতা হাফেয আবদুল হক যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন তা ছাড়াও সবচেয়ে বড় আপত্তি হচ্ছে এটি স্পষ্টরূপে কুরআনের পরিপন্থী। কারণ, কুরআন মজীদ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে। তার মধ্যে প্রথমটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে একটি উঁচু দিগন্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى বিষয়ক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টি সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ওপরে বর্ণিত এ রেওয়ায়াতটি দু'টি সাক্ষাতের ঘটনাকে একসাথে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি করে একই সাক্ষাত বানিয়ে ফেলেছে। অতএব কুরআন মজীদের পরিপন্থী হওয়ার কারণে কোন ক্রমেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

এরপর ওপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রসংগে আসা যাক। ও গুলোর মধ্যে আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোই

অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁরা উভয়েই ঐকমত্য সহকারে খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা বর্ণনা করেছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহ তা'আলাকে নয়, জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন। তাছাড়া এসব হাদীস কুরআন মজীদের বক্তব্য ও ইংগিতের সাথেও সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। এছাড়া হযরত আবু যার (রা) এবং হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবীর (সা) যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে গুরুতর অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন হাদীসে উভয় সাক্ষাতকেই চাক্ষুষ সাক্ষাত বলা হয়েছে, কোনটাতে উভয় সাক্ষাতকেই অন্তরের সাক্ষাত বলা হয়েছে, কোনটাতে একটি সাক্ষাতকে চাক্ষুষ অপরটাকে অন্তরের বলা হয়েছে, আবার কোনটাতে চাক্ষুষ দর্শনকে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করা হয়েছে। এসব বর্ণনার একটিও এমন নয় যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কোন কথা বা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন সেখানে প্রথমত কুরআন মজীদে বর্ণিত এ দু'টি সাক্ষাতলাভের কোনটিরও নামের উল্লেখ নেই। তাছাড়া তাদের একটি রেওয়ায়াতের ব্যাখ্যা অন্য রেওয়ায়াত থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে নবী (সা) কোন সময়ই জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি, স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযীর বর্ণনাসমূহে যদিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে কিন্তু যেসব সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা) থেকে একথা শুনেছেন তাতে তাদের নাম বলা হয়নি। তার একটিতে আবার বলা হয়েছে যে, নবী (সা) চাক্ষুষ দেখার বিষয় সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

১৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমরা তো তাকে গোমরাহী ও কুপথগামিতা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ এ জ্ঞান তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে চাক্ষুষভাবে এমন সব সত্য ও বাস্তবতা দেখিয়েছেন যার সাক্ষ তিনি তোমাদের সামনে পেশ করছেন। এখন তেমরা নিজেরাই একটু ভেবে দেখ, যে আকীদা-বিশ্বাস মেনে চলার জন্য তোমরা গোঁ ধরে আছো তা কত অযৌক্তিক। অন্য দিকে যে ব্যক্তি তোমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন তার বিরোধীতা করে তোমরা কার ক্ষতি করছো? এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তিনজন দেবীর কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যাদেরকে মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং হিজাজের আশে পাশের লোক জন বেশী বেশী পূজা করতো। তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখনো কি তোমরা বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করে দেখেছো, যমীন ও আসমানের প্রভূত্বের ক্ষেত্রে এদের সামান্যতম দখল বা কর্তৃত্বও থাকতে পারে কি? না বিশ্ব-জাহানের প্রভুর সাথে সত্যিই তাদের কোন সম্পর্ক হতে পারে?

লাতের আস্তানা ছিল তায়েফে। বনী সাকীফ গোত্র তার এত ভক্ত ছিল যে, আবরাহা যে সময়, হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কার ওপর আক্রমণ করতে

যাচ্ছিল তখন তারা শুধু তাদের এ উপাস্যের আস্তানা রক্ষা করার জন্য সে অত্যাচারীকে মক্কার রাস্তা দেখানোর জন্য পথ প্রদর্শক সরবরাহ করেছিল যাতে সে লাতের কোন ক্ষতি না করে। অথচ কা'বা যে আল্লাহর ঘর গোটা আরববাসীর মত স্যকীফ গোত্রও একথা বিশ্বাস করতো। লাত শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে জারীর তাবারীর জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ হচ্ছে এ শব্দটি আল্লাহ শব্দের স্ত্রীলিংগ। মূল শব্দটি ছিল اللهة । এটিকেই পরিবর্তন করে اللات করা হয়েছে। যামাখশারীর মতে— لوى يلوى থেকে শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ ঘুরা বা কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া। মুশরিকরা যেহেতু ইবাদাতের জন্য তার প্রতি মনযোগী হতো, তার সামনে ঝুঁকতো এবং তার তাওয়াফ করতো তাই তাকে 'লাত' আখ্যা দেয়া শুরু হলো। ইবনে আব্বাস تا বর্ণটিতে "তাশদীদ" প্রয়োগ করে لاتّ পড়তেন এবং لت يلت থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে বলতেন। এর অর্থ মন্থন করা বা লেপন করা। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, মূলত সে ছিল একজন মানুষ, যে তায়েফের সন্নিকটে এক কঙ্করময় ভূমিতে বাস করতো এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের ছাতু ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়াতো। সে মারা গেলে লোকেরা ঐ কঙ্করময় ভূমিতে তার নামে একটা আস্তানা গড়ে তোলে এবং তার উপাসনা করতে শুরু করে। কিন্তু লাতের এ ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদের মত সম্মানিত ব্যক্তিদের থেকে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি কারণ হলো একে لات (লাত) বলা হয়েছে لاتّ ("লাত্তা") বলা হয়নি। অপর কারণটি হলো কুরআন মজীদ তিনজনকেই দেবী বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু বর্ণিত হাদীস অনুসারে সে পুরুষ ছিল নারী নয়।

عزى (উয্‌যা) শব্দটির উৎপত্তি عزت শব্দ থেকে। এর অর্থ সম্মানিতা। এটা ছিল কুরাইশদের বিশেষ দেবী। এর আস্তানা ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী "নাখলা" উপত্যকার "হুরাদ" নামক স্থানে (নাখলার অবস্থান জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল–আহকাফ, টীকা–৩৩) বনী হাশেমের মিত্র বনী শায়বান গোত্রের লোক এর প্রতিবেশী ছিল। কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন এর যিয়ারতের জন্য আসতো, এর উদ্দেশ্যে মানত করতো এবং বলি দান করতো। কা'বার মত এ স্থানটিতেও কুরবানী বা বলির জন্তু নিয়ে যাওয়া হতো এবং এটিকে সমস্ত মূর্তির চেয়ে অধিক সম্মান দেয়া হতো। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, আবু উহায়হার মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে আবু লাহাব তাকে রোগ শয্যায় দেখতে গিয়ে দেখলো সে কাঁদছে। আবু লাহাব জিজ্ঞেস করলো ঃ আবু উহায়হা, তুমি কাঁদছো কেন? তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছো? মৃত্যু তো সবারই হবে। সে বললো ঃ আল্লাহর শপথ, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদছি না। আমার মৃত্যুর পর উয্‌যার পূজার কি উপায় হবে সে দুশ্চিন্তা আমাকে নিশেষ করে দিচ্ছে। আবু লাহাব বললো ঃ তোমার জীবদ্দশায়ও তোমার কারণে উয্‌যার পূজা করা হতো না আর তোমার মৃত্যুর পরে তাকে পরিত্যাগ করাও হবে না। আবু উহায়হা বললো ঃ এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, আমার মৃত্যুর পরে কেউ অবশ্যই আমার স্থান পূরণ করবে।

মানাতের আস্তানা ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝে লোহিত সাগরের তীরবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে। বিশেষ করে খুযা'আ, আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা এর খুব ভক্ত ছিল। তার হজ্জ ও তাওয়াফ করা হতো এবং তার উদ্দেশ্যে মানতের বলি দেয়া হতো। হজ্জের মওসুমে হাজীরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং আরাফাতে ও মিনায় অবস্থানের পর সেখান থেকে মানাতের যিয়ারত তথা দর্শনলাভের জন্য লাব্বায়কা লাব্বায়কা ধ্বনি দিতে শুরু করতো। যারা এ দ্বিতীয় হজ্জের নিয়ত করতো তারা সাফা এবং মারওয়ার মাঝে সাঈ করতো না।

১৬. অর্থাৎ এসব দেবীদেরকে তোমরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে ধরে নিয়েছো। এ অর্থহীন আকীদা–বিশ্বাস গড়ে নেয়ার সময় তোমরা আদৌ এ চিন্তা করনি যে, মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমানকর ও লজ্জাকর মনে করে থাকো। তোমরা চাও যেন তোমরা পুত্র সন্তান লাভ করো। কিন্তু যখন আল্লাহর সন্তান আছে বলে ধরে নাও, তখন তাঁর জন্য কন্যা সন্তান বরাদ্দ করো।

১৭. অর্থাৎ তোমরা যাদের দেবী ও দেবতা বলে থাকো তারা দেবীও নয় দেবতাও নয়। তাদের মধ্যে খোদায়ীর কোন বৈশিষ্টও যেমন দেখা যায় না, তেমনি প্রভুত্বের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সামান্যতম অংশও তাদের মধ্যে নেই। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে আল্লাহর সন্তান, উপাস্য এবং প্রভুত্বের অংশীদার বানিয়ে নিয়েছো। নিজেদের মনগড়া এসব বিষয়ের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন প্রমাণ তোমরা পেশ করতে সক্ষম নও।

১৮. অন্য কথায় তাদের গোমরাহীর মৌলিক কারণ দু'টি ঃ এক, তারা কোন জিনিসকে নিজেদের আকীদা–বিশ্বাস ও দীন বানিয়ে নেয়ার জন্য প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না, বরং অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি জিনিস মেনে নেয় এবং পরে এমনভাবে তা বিশ্বাস করে নেয়, যেন সেটিই সত্য ও বাস্তব। দুই, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের নফসের নানা রকম কামনা বাসনা পূরণ করার জন্যই এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে থাকে। তাদের মন চায় তাদের এমন কোন উপাস্য থাকুক যে দুনিয়ায় তাদের আশা–আকাংখা পূরণ করবে এবং আখেরাত যদি সংঘটিত হয়–ই, তাহলে সেখানে তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু সে হালাল হারামের কোন বাধ্য বাধকতা আরোপ করবে না এবং কোন রূপ নৈতিক বিধি–বন্ধনেও আবদ্ধ করবে না। একারণেই তারা নবী–রসূলদের আনীত নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হতো না। এবং নিজেদের গড়া এসব দেবদেবীর দাসত্ব করাই তাদের মনঃপুত ছিল।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী–রসূলগণ এসব পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারপর এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সত্যিকার অর্থে বিশ্ব–জাহানের প্রভুত্ব কার তা জানিয়ে দিয়েছেন।

২০. এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, যাকে ইচ্ছা তাকেই উপাস্য বানিয়ে নেয়ার অধিকার কি মানুষের আছে? এর তৃতীয় একটি অর্থ এও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ঐসব উপাস্যের কাছে মানুষ তার কামনা–বাসনা ও আকাংখা পূরণের যে আশা করে তা কি কখনো পূরণ হওয়া সম্ভব?

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২ রুকূ'

আসমানে তো কত ফেরেশতা আছে যাদের সুপারিশও কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন।[২১] কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তারা ফেরেশতাদেরকে দেবীদের নামে নামকরণ করে।[২২] অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা কেবলই বদ্ধমূল ধারণার অনুসরণ করছে।[২৩] আর ধারণা কখনো জ্ঞানের প্রয়োজন পূরণে কোন কাজে আসতে পারে না।

সুতরাং হে নবী, যে আমার উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়[২৪] এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া যার আর কোন কাম্য নেই তাকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।[২৫]

২১. অর্থাৎ তোমাদের এসব মনগড়া উপাস্যদের সুপারিশ উপকারে আসা তো দূরের কথা, সমস্ত ফেরেশতা মিলেও যদি কারো জন্য সুপারিশ করে তথাপিও তা তার কাজে আসবে না। প্রভুত্বের এখতিয়ারসমূহ সবই পুরোপুরি আল্লাহর হাতে। যদি আল্লাহ তা'আলা কারো পক্ষে সুপারিশ করতে কাউকে অনুমতি না দেন এবং কারো পক্ষে সুপারিশ শুনতে সম্মত না হন তাহলে ফেরেশতাও তাঁর কাছে কারো জন্য সুপারিশ করার সাহস দেখাতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তাদের একটি নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে, তারা এখতিয়ার ও ক্ষমতাহীন ফেরেশতাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ পর্যন্ত করার সামর্থ ও সাহস রাখে না। তাছাড়া আরো নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে এই যে, তারা তাদেরকে নারী বলে মনে করে এবং আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করে। এসব অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। তারা যদি আখেরাতে বিশ্বাস করতো তাহলে এ ধরনের দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলতে পারতো না। আখেরাতের অস্বীকৃতি তাদেরকে পরিণাম সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন করে দিয়েছে। তারা মনে করে, আল্লাহকে

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝٣٠ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَسَاۗءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝٣١ اَلَّذِيْنَ
يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۗىِٕرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ
هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ
اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝٣٢

এদের[২৬] জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই।[২৭] তোমার রবই অধিক জানেন—কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে। যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ[২৮]—যাতে[২৯] আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান দেন এবং যারা ভাল নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে তাদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে পুরস্কৃত করেন। যারা বড় বড় গোনাহ[৩০] এবং প্রকাশ্য ও সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ[৩১] থেকে বিরত থাকে—তবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা[৩২]—নিশ্চয়ই তোমার রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক।[৩৩] যখন তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ আকারে ছিলে তখন থেকে তিনি তোমাদের জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করো না। সত্যিকার মুত্তাকী কে তা তিনিই ভাল জানেন।

মানা বা না মানা কিংবা হাজার জন খোদাকে মানায় কোনই পার্থক্য নেই। কারণ তারা এসব আকীদা-বিশ্বাসের কোনটিরই কোন ভাল বা মন্দ পরিণাম দুনিয়ার বর্তমান জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখে না। আল্লাহদ্রোহী মুশরিক কিংবা তাওহীদবাদী যাই হোক না কেন এখানে সবার ফসলই পাকতে এবং ধ্বংস হতে দেখা যায়। সবাই রোগাক্রান্ত হয় আবার সুস্থও হয়ে ওঠে। সব রকম ভাল ও মন্দ পরিস্থিতি সবার জন্যই আসে। তাই কোন ব্যক্তি কাউকে উপাস্য মানুক বা না মানুক কিংবা যত ও যেভাবে ইচ্ছা উপাস্য বানিয়ে নিক এটা তাদের কাছে কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ বা সুবিবেচনা পাওয়ার মত বিষয় নয়। তাদের মতে হক এবং বাতিলের ফায়সালা যখন এ দুনিয়াতেই হতে হবে আর এ দুনিয়াতে প্রকাশিত ফলাফল দ্বারাই তা নিরূপিত হবে তখন একথা স্পষ্ট যে, এখানে প্রকাশিত ফলাফল কোন আকীদা-বিশ্বাসের ন্যায় ও সত্য হওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালা যেমন করে না, তেমনি অন্যসব আকীদা-বিশ্বাসের বাতিল হওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালাও দেয় না। কাজেই এরূপ

লোকদের পক্ষে একটি আকীদা–বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং আরেকটিকে প্রত্যাখ্যান করা মনের খেয়ালীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৩. অর্থাৎ ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এবং আল্লাহর কন্যা এ বিশ্বাসটি তারা জ্ঞান অর্জনের কোন একটি মাধ্যম ছাড়া জানতে পেরেছে বলে অবলম্বন করেনি। বরং নিজেদের অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়টা স্থির করে নিয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই এসব আস্তানা গড়ে নিয়েছে। তাদের কাছেই মনের কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করছে এবং নযর–নেওয়াজ পেশ করা হচ্ছে।

২৪. এখানে 'যিকর' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরআন হতে পারে কিংবা শুধু উপদেশবাণী হতে পারে এবং আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহর কথা শুনতে একদম পছন্দ করে না।

২৫. অর্থাৎ তার পিছে লেগে থেকো না এবং তাকে বুঝানোর জন্য নিজের সময় নষ্ট করো না। কেননা এ প্রকৃতির লোক এমন কোন দাওয়াত বা আন্দোলনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে না যার ভিত্তি আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা দুনিয়ার বস্তুগত লাভের চেয়ে অনেক উচ্চতর উদ্দেশ্য ও মূল্যমানের দিকে আহবান জানায় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সৌভাগ্যই যার মূল লক্ষ। এ ধরনের বস্তুপূজারী এবং আল্লাহ বিমুখ মানুষের পেছনে নিজের শ্রম ব্যয় করার পরিবর্তে যারা আল্লাহর কথা শুনতে প্রস্তুত এবং দুনিয়া পূজার ব্যধিতে আক্রান্ত নয় তাদের দিকে মনযোগ দাও।

২৬. এটি পূর্বাপর প্রসংগহীন একটি বাক্য যা কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে আগের কথার ব্যাখ্যা হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ এসব লোক দুনিয়া এবং দুনিয়াবী স্বার্থের উর্ধে আর কিছুই জানে না এবং কিছু চিন্তাও করতে পারে না। তাই তাদের পেছনে পরিশ্রম করা বৃথা।

২৮. অন্য কথায় কোন মানুষের পথভ্রষ্ট বা সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার ফায়সালা যেমন এ পৃথিবীতে হবে না তেমনি এর ফায়সালা দুনিয়ার মানুষের মতামতের ওপর ছেড়ে দেযাও হয়নি। এর ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনিই যমীন ও আসমানের মালিক এবং দুনিয়ার মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যেসব পথে চলছে তার কোন্‌টি হিদায়াতের পথ এবং কোন্‌টি গোমরাহীর পথ তা কেবল তিনিই জানেন। অতএব আরবের এসব মুশরিক এবং মক্কার কাফেররা যে তোমাকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছে আর নিজেদের জাহেলিয়াতকে হিদায়াত বলে মনে করছে সে জন্য তুমি মোটেই পরোয়া করবে না। এরা যদি নিজেদের এ ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে ডুবে থাকতে চায় তাহলে তাদের ডুবে থাকতে দাও। তাদের সাথে তর্ক–বিতর্ক করে সময় নষ্ট করা এবং মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।

২৯. আগে থেকেই যে বক্তব্য চলছিলো এখান থেকে পুনরায় তার ধারাবাহিকতা শুরু হচ্ছে। সুতরাং মাঝখানের পূর্বাপর প্রসংগহীন কথাটা বাদ দিলে বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় এরূপ ঃ "তাকে তার আপন অবস্থায় চলতে দাও। যাতে আল্লাহ অন্যায়কারীকে তার কাজের প্রতিফল দান করেন।"

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা ৫৩।

৩১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ১৩০, আন নাহল, টীকা ৮৯ ।

৩২. মূল শব্দ হচ্ছে إِلَّا اللَّمَمَ । কোন জিনিসের অতি সামান্য পরিমাণ কিংবা নগণ্য প্রভাব অথবা শুধু নৈকট্য বা সামান্য দেরী থাকা বুঝাতে আরবী ভাষায় لمم শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় أَلَمَّ بِالْمَكَانِ সে অমুক স্থানে সামান্য কিছু সময় মাত্র অবস্থান করেছে কিংবা সামান্য সময়ের জন্য গিয়েছে أَلَمَّ بِالطَّعَامِ সে সামান্য খাবার খেয়েছে। بِهِ لَمَمٌ তার মস্তিষ্কে কিছুটা বিকৃতি আছে কিংবা তাতে কিছু উন্মাদনা ভাব আছে। কেউ যখন কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী হয় কিন্তু কাজটি তখনো করা হয়নি এমন অবস্থা বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ফাররা বলেন, আমি আরবদেরকে এভাবে বলতে শুনেছি ضربه ما لمم القتل অমুক ব্যক্তি তাকে এত মেরেছে যে, কেবল হত্যা করা বাকি আছে। এবং أَلَمَّ يَفْعَلُ অমুক ব্যক্তি এ কাজ প্রায় করেই ফেলেছিলো। কবি বলেছেন ঃ ألمت فحيت ثم قامت فودعت "সে মুহূর্তের জন্য আসলো, সালাম দিল, উঠলো এবং বিদায় হয়ে গেল"

এসব ব্যবহারের দিক লক্ষ করে তাফসীরকারদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের لمم শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন ছোট গোনাহ। কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, ব্যক্তির কার্যত বড় গোনাহর নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত না হওয়া। কেউ কেউ একে ক্ষণিকের জন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে পরে তা থেকে বিরত হওয়া অর্থে গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি গোনাহর কল্পনা, ইচ্ছা কিংবা সংকল্প করবে ঠিকই কিন্তু কার্যত কোন পদক্ষেপ নেবে না। এ বিষয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

যায়েদ ইবনে আসলাম ও ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এর অর্থ মানুষ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলী যুগে যেসব গোনাহ করেছে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) একটি মতও তাই।

ইবনে আব্বাসের (রা) দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, ব্যক্তির কোন বড় গোনাহ বা অশ্লীল কাজে অল্প সময়ের জন্য কিংবা ভুলক্রমে কখনো লিপ্ত হয়ে পড়া এবং পরে তা পরিত্যাগ করা। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আমর ইবনে আস, মুজাহিদ (রা) হাসান বাসরী (র) এবং আবু সালেহর (র) মতও তাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মাসরূক এবং শা'বী বলেন ঃ এর অর্থ কোন ব্যক্তির কোন বড় গোনাহের নিকটবর্তী হওয়া এবং তার প্রাথমিক পর্যায়সমূহ অতিক্রম করা কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে বিরত থাকা। যেমন ঃ কেউ চুরি করার উদ্দেশ্যে বের হলো কিন্তু চুরি করা থেকে বিরত থাকলো। কিংবা পরনারীর সাথে মেলামেশা করলো কিন্তু ব্যভিচার করতে অগ্রসর হলো না। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও এ মতটি উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদা এবং দাহ্‌হাক বলেন ঃ এর অর্থ এমন ছোট ছোট গোনাহ যার জন্য দুনিয়াতে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং আখেরাতেও আযাব দেয়ার কোন ভয় দেখানো হয়নি।

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰٓ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৩ রুকূ'

হে নবী, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো যে আল্লাহর পথ থেকে ফিরে গিয়েছে এবং সামান্য মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে?৩৪ তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে সে প্রকৃত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে?৩৫ তার কাছে কি মূসার সহীফাসমূহের কোন খবর পৌছেনি? আর আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে৩৬ যে ইবরাহীম তার সহীফাসমূহের কথাও কি পৌছেনি?

একথা যে, "কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।"৩৭

একথা যে, মানুষ যে চেষ্টা সাধনা করে তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।৩৮

একথা যে, "তার চেষ্টা–সাধনা অচিরেই মূল্যায়ণ করা হবে৩৯ এবং তাকে তার পুরো প্রতিদান দেয়া হবে।"

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন ঃ এর অর্থ মনে গোনাহের চিন্তার উদ্রেক করা কিন্তু কার্যত তাতে লিপ্ত না হওয়া।

এগুলো হচ্ছে, সম্মানিত সাহাবা ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা যা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তী কালের তাফসীরকার, ইমাম ও ফিকাহবিদদের অধিকাংশই এ মত পোষণ করেন যে, এ আয়াত এবং সূরা নিসার ৩১ আয়াত সুস্পষ্টরূপে গোনাহকে সগীরা ও কবীরা এই দু'টি বড় ভাগে বিভক্ত করেছে। এ দু'টি আয়াত মানুষকে আশান্বিত করে যে, তারা যদি বড় বড় গোনাহ ও অশ্লিল কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ছোট ছোট গোনাহ মাফ করে দেবেন। যদিও দু'য়েকজন বড় আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন গোনাহই ছোট নয়। আল্লাহর অবাধ্যতা মাত্রই বড় গোনাহ। কিন্তু ইমাম গায্‌যালী (র) বলেছেন ঃ কবীরা ও সগীরা গোনাহের পার্থক্য এমন একটি বিষয় যা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, যেসব উৎস থেকে শরীয়াতের হুকুম–আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা যায় তার সবগুলোতেই এর উল্লেখ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, সগীরা ও কবীরা গোনাহর মধ্যে পার্থক্য কি? এবং কি ধরনের গোনাহ সগীরা আর কি ধরনের গোনাহ কবীরা? এ ব্যাপারে কবীরা ও সগীরা গোনাহর যে সংজ্ঞায় আমরা পূর্ণরূপে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত তা হচ্ছে, "যে গোনাহকে কিতাব ও

সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট উক্তিতে হারাম বলা হয়েছে অথবা যে গোনাহর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল দুনিয়াতে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন অথবা যে গোনাহের কারণে আখেরাতে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন বা অভিশাপ দিয়েছেন অথবা তাতে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আযাব নাযিলের খবর দিয়েছেন" এ ধরনের সমস্ত গোনাহই কবীরা গোনাহ। এ প্রকৃতির গোনাহ ছাড়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে আর যত রকমের অপছন্দনীয় কাজ আছে তার সবই সগীরা গোনাহর সংজ্ঞায় পড়ে। একইভাবে কেবলমাত্র গোনাহের আকাংখা পোষণ করা কিংবা ইচ্ছা করাও কবীরা গোনাহ নয়, সগীরা গোনাহ। এমন কি কোন বড় গোনাহর প্রাথমিক পর্যায়সমূহ অতিক্রম করাও ততক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গোনাহ নয় যতক্ষণ না ব্যক্তি কার্যত তা করে বসবে। তবে সগীরা গোনাহও যখন ইসলামী বিধানকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করা হয়, আল্লাহ তা'আলার মোকবিলায় অহংকারের মনোবৃত্তি নিয়ে করা হয় এবং যে শরীয়াত একে খারাপ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে তাকে আদৌ গুরুত্ব দেয়ার উপযুক্ত মনে করা না হয় তখন তা কবীরা গোনাহে রূপান্তরিত হয়।

৩৩. অর্থাৎ সগীরা গোনাহকারী ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়ার কারণ এ নয় যে, সগীরা গোনাহ কোন গোনাহই নয়। বরং এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের সাথে সংকীর্ণচেতার মত আচরণ এবং ছোট ছোট ব্যাপারে পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করেন না। বান্দা যদি নেকীর পথ অনুসরণ করে এবং বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি তাকে পাকড়াও করবেন না। অশেষ রহমতের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৩৪. কুরাইশদের বড় নেতাদের অন্যতম ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইবনে জারীর তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যক্তি প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করতে মনস্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু তার এক মুশরিক বন্ধু জানতে পারলো যে, সে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। সে তাকে বললো, তুমি পিতৃধর্ম ত্যাগ করো না। যদি তুমি আখেরাতের আযাবের ভয় পেয়ে থাকো তাহলে আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও, তোমার পরিবর্তে আমি সেখানকার আযাব ভোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। ওয়ালীদ একথা মেনে নিল এবং আল্লাহর পথে প্রায় এসে আবার ফিরে গেল। কিন্তু সে তার মুশরিক বন্ধুকে যে পরিমাণ অর্থ দেবে বলে ওয়াদা করেছিল তার সামান্য মাত্র দিয়ে অবশিষ্ট অংশ বন্ধ করে দিল। এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বেগ এবং দীনের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে কি ধরনের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে নিমগ্ন করে রেখেছে।

৩৫. অর্থাৎ সে কি জানতে পেরেছে যে, এ আচরণ তার জন্য সত্যিই কল্যাণকর? সে কি জানতে পেরেছে যে, এভাবে কেউ আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারে?

৩৬. হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহে যে শিক্ষা নাযিল করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্তসার এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত মূসার সহীফাসমূহ বলতে তো তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহ আজ পৃথিবীতে কোথাও বর্তমান নেই। তাছাড়া ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থসমূহেও তার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার দু'টি

স্থানে ইবরাহীমের সহীফার শিক্ষাসমূহের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তার একটি স্থান হলো এটি এবং অপর স্থানটি হলো সূরা আল আ'লার শেষ কয়েকটি আয়াত।

৩৭. এ আয়াত থেকে তিনটি বড় মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী। দুই, একজনের কাজের দায়দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না তবে সেই কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা থাকলে ভিন্ন কথা। তিন, কেউ চাইলেও অন্য কারো কাজের দায়দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে পারে না। আর প্রকৃত অপরাধীকে এ কারণে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না যে, তার শাস্তি ভোগ করার জন্য অন্য কেউ এগিয়ে আসছে।

৩৮. একথাটি থেকেও তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি যা পরিণতি ভোগ করবে তা তার কৃতকর্মেরই ফল। দুই, একজনের কর্মফল অন্যজন ভোগ করতে পারে না। তবে ঐ কাজের পেছনে তার কোন ভূমিকা থাকলে তা ভিন্ন কথা। তিন, চেষ্টা–সাধনা ছাড়া কেউ–ই কিছু লাভ করতে পারে না।

কোন কোন ব্যক্তি এ তিনটি মূলনীতিকে ভুল পন্থায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজের কষ্টার্জিত আয় (Earned Income) ছাড়া কোন কিছুর বৈধ মালিক হতে পারে না। কিন্তু একথা কুরআন মজীদেরই দেয়া কিছু সংখ্যক আইন ও নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। উদাহরণ হিসেবে উত্তরাধিকার আইনের কথা বলা যেতে পারে। এ আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে বহু সংখ্যক লোক অংশ পায় এবং বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত এ সম্পদ তার শ্রম দ্বারা অর্জিত নয়। শত যুক্তি দেখিয়েও একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদে তার শ্রমের কোন ভূমিকা আছে। অনুরূপভাবে যাকাত ও সাদকার বিধান অনুসারে শুধুমাত্র শরয়ী ও নৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে একজনের অর্থ–সম্পদ অন্যেরা লাভ করে থাকে। এভাবে তারা ঐ সম্পদের বৈধ মালিকানা লাভ করে। কিন্তু সেই সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে তার শ্রমের কোন অংশ থাকে না। অতএব কুরআনের কোন একটি আয়াত নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে কুরআনের অন্যান্য শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আবার কিছু সংখ্যক লোক এসব মূলনীতিকে আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত ধরে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এসব মূলনীতি অনুসারে এক ব্যক্তির কাজ কি কোন অবস্থায় অপর ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হতে পারে? এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির জন্য কিংবা তার পরিবর্তে কোন আমল করে তাহলে তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা যেতে পারে? এক ব্যক্তির আমল কি অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া সম্ভব? এসব প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয় তাহলে "ইসালে সওয়াব" বদলি হজ্জ ইত্যাদি সবই না জায়েজ হয়ে যায়। এমন কি অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা যার জন্য দোয়া করা হবে সেই দোয়াও তার নিজের কাজ নয়। তবে শুধুমাত্র মু'তাযিলারা ছাড়া ইসলামের অনুসারীদের মধ্য থেকে আর কেউ–ই এ চরম দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেনি। শুধু তারাই এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করে থাকে যে এক ব্যক্তির চেষ্টা–সাধনা কোন অবস্থায়ই অন্যের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। অপরদিকে আহলে সুন্নাত একজনের

দোয়া অন্যের জন্য কল্যাণকর হওয়ার বিষয়টা সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে। কেননা, কুরআন থেকেই তা প্রমাণিত। "ইসালে সওয়াব" এবং অন্য কারো পক্ষ থেকে কৃত কোন নেক কাজের কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মৌলিক দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, বরং বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান।

(১) ইসালে সওয়াব হলো, এক ব্যক্তির কোন নেক কাজ করে তার সওয়াব ও প্রতিদান অপর কোন ব্যক্তিকে দেয়া হোক বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। এ মাসয়ালা সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ নিরেট শারীরিক ইবাদাত যেমন ঃ নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির সওয়াব অন্যেরা পেতে পারে না। তবে আর্থিক ইবাদাত যেমন ঃ সাদকা কিংবা আর্থিক ও শারিরীক উভয়টির সংমিশ্রিত ইবাদাত যেমন ঃ হজ্জ—এ সবের সওয়াব অন্যে পেতে পারে। কারণ, মূলনীতি হিসেবে এটা অবিসম্পাদিত যে, এক ব্যক্তির আমল অন্যের কল্যাণে আসবে না। তবে, অনেক সহীহ হাদীসের ভাষ্য অনুসারে যেহেতু সাদকার সওয়াব পৌঁছানো যায় এবং বদলি হজ্জও করা যায়, তাই আমরা এ প্রকৃতির ইবাদাতের "ইসালে সওয়াব" বা সওয়াব পৌঁছানোর বৈধতা স্বীকাব করছি। পক্ষান্তরে হানাফী আলেমদের রায় হলো, মানুষ তাঁর সব রকম নেক আমলের সওয়াব অপরকে দান করতে পারে—তা নামায হোক বা রোযা, কুরআন তিলাওয়াত হোক বা যিকর কিংবা সাদকা হোক বা হজ্জ ও উমরা হোক। এর স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, শ্রমের কাজ করে মানুষ যেমন মালিককে বলতে পারে, এর পারিশ্রমিক আমার পরিবর্তে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হোক। তেমনি কোন নেক কাজ করে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করতে পারে এ কাজের প্রতিদান আমার পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হোক। এ ক্ষেত্রে কতিপয় নেকীর কাজকে বাদ দিয়ে অন্য কতিপয় নেকীর কাজের মধ্যে একে সীমিত রাখার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। এ বিষয়টি বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঃ

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজা, তাবারানী (ফিল–আওসাত) মুসতাদরিক এবং ইবনে আবী শায়বাতে হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবু রাফে', হযরত আবু তালহা আনসারী এবং হুযাইফা ইবনে উসাইদুল গিফারী কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি ভেড়া নিয়ে তার একটি নিজের ও নিজের পরিবারের সবার পক্ষ থেকে এবং অপরটি তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে কুবরানী করেছেন।

মুসলিম, বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমার মা অকস্মাত মারা গিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে অবশ্যই সাদকা করার জন্য বলতেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করি তাহলে তিনি কি তার প্রতিদান পাবেন? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার দাদা আস ইবনে ওয়ায়েল জাহেলী যুগে একশত উট কুরবানী করার মানত করেছিলেন। তার চাচা হিশাম ইবনুল আস তার অংশের পঞ্চাশটি উট কুরবানী করে দিয়েছেন। হযরত আমর ইবনুল আস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস

করলেন, তিনি কি করবেন। নবী (সা) বললেন ঃ তোমার পিতা যদি তাওহীদের অনুসারী হয়ে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো অথবা সাদকা করো। এতে তার কল্যাণ হবে।

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে হযরত হাসান বাসরীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমার মা ইনতিকাল করেছেন? আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আরো কিছু সংখ্যক হাদীস আছে। ঐ সব হাদীসেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদকা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, তা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর।

দারু কুতনীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি আমার পিতা–মাতার সেবা তাঁদের জীবদ্দশায়ও করে যাচ্ছি। তাঁদের মৃত্যুর পর কিভাবে সেবা করবো? তিনি বললেন ঃ "তাদের মৃত্যুর পর তোমার নামাযের সাথে তাদের জন্যও নামায পড়বে, তোমার রোযার সাথে তাদের জন্য রোযা রাখবে, এটাও তাদের সেবার অন্তরভুক্ত।" দারু কুতনীতে হযরত আলী (রা) থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে তিনি বলেন ঃ নবী (সা) বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং এগার বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়ে ঐ কবরস্থানের মৃতদের জন্য দোয়া করে তাহলে ওখানে যত মৃত আছে তাদের সকলকে সওয়াব দান করা হবে। একটি আরেকটির সমর্থক এ ধরনের বিপুল সংখ্যক হাদীস এ বিষয় স্পষ্ট করে দেয় যে, "ইসালে সওয়াব" বা সওয়াব পৌছানো শুধু সম্ভবই নয়, বরং সব রকম ইবাদাত এবং নেকীর কাজের সওয়াব পৌছানো যেতে পারে। এ জন্য বিশেষ ধরনের আমল বা ইবাদাত নির্দিষ্ট নেই। তবে এ প্রসংগে চারটি বিষয় খুব ভালভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ কেবল এমন আমলের সওয়াবই পৌছানো যেতে পারে যা নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরীয়াতের নিয়ম–কানুন মাফিক করা হয়েছে। তা নাহলে একথা স্পষ্ট যে, গায়রুল্লাহর জন্য কিংবা শরীয়াতের বিধি–বিধানের পরিপন্থী কোন কাজ বা ইবাদাত করা হলে তা অন্য কারো জন্য দান করা তো দূরের কথা আমলকারী নিজেই তার কোন সওয়াব পেতে পারে না।

দুই ঃ যেসব ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সৎলোক হিসেবে মেহমান হয়ে আছে তারা তো নিশ্চিতভাবেই এ সওয়াবের উপহার লাভ করবেন। কিন্তু যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে হাজতে বন্দী আছে তাদের কাছে কোন সওয়াব পৌছবে বলে আশা করা যায় না। আল্লাহর মেহমানদের কাছে তো উপহার পৌছতে পারে। কিন্তু আল্লাহর বন্দীদের কাছে উপহার পৌছার কোন আশা নেই। কোন ব্যক্তি যদি ভুল বুঝার কারণে তার জন্য ইসালে সওয়াব করে তাহলে তার সওয়াব নষ্ট হবে না, বরং অপরাধীর কাছে পৌছার বদলে মূল আমলকারীর কাছে ফিরে আসবে। ঠিক মানি অর্ডার যেমন প্রাপকের হাতে না পৌছলে প্রেরকের কাছে ফিরে আসে।

তিন ঃ সওয়াব পৌছানো সম্ভব কিন্তু আযাব পৌছানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেউ নেককাজ করে অন্য কাউকে তার সওয়াব দান করবে এটা সম্ভব কিন্তু গোনাহর কাজ করে তার আযাব অন্য কাউকে দান করবে আর তা তার কাছে পৌছে যাবে, তা সম্ভব নয়।

চার ঃ নেক কাজের দু'টি কল্যাণকর দিক আছে। একটি হচ্ছে নেক কাজের সে শুভ ফলাফল যা আমলকারীর ব্যক্তিসত্তায় ও চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং যার কারণে সে আল্লাহর পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ত তার সেই সব প্রতিদান যা তাকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার হিসেবে দান করেন। এর প্রথমটির সাথে ইসালে সওয়াবের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু দ্বিতীয়টির সাথে এর সম্পর্ক। এর উদাহরণ হলো ঃ কোন ব্যক্তি শরীর চর্চার মাধ্যমে কুস্তিতে দক্ষতা লাভের চেষ্টা করে। এভাবে তার মধ্যে যে শক্তি ও দক্ষতা সৃষ্টি হয় তা সর্বাবস্থায় তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তা অন্য কাউকে দেয়া যায় না। অনুরূপভাবে সে যদি কোন রাজ দরবারের কর্মচারী হয় এবং কুস্তিগীর হিসেবে তার জন্য একটি বেতন নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সে বেতনও শুধু সে-ই পাবে। অন্য কাউকে তা দেয়া হবে না। তবে তার কর্মতৎপরতায় খুশী হয়ে তার পৃষ্ঠপোষক তাকে যেসব পুরস্কার ও উপহার দেবে সেগুলো সম্পর্কে সে আবেদন করতে পারে যে তা তার শিক্ষক, মাতা-পিতা কিংবা অন্য কল্যাণকামী ও হিতাকাংখীদের দেয়া হোক। নেক কাজের ব্যাপারটাও তাই। এর আত্মিক কল্যাণসমূহ হস্তান্তর যোগ্য নয়। তার প্রতিদানও কাউকে হস্তান্তর করা যায় না। কিন্তু তার পুরস্কার ও সওয়াব সম্পর্কে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করতে পারে যে, তা তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা কোন কল্যাণকামীকে দান করা হোক। এ কারণে একে 'ইসালে জাযা' প্রতিদান পৌছানো নয়, "ইসালে সওয়াব" সওয়াব পৌছানো বলা হয়ে থাকে।

(২) এক ব্যক্তির চেষ্টা ও তৎপরতা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য উপকারী হওয়ার আরেকটি রূপ হচ্ছে, ব্যক্তি হয় অন্য কারো ইচ্ছা বা ইংগিতে তার জন্য কোন নেক কাজ করবে। কিংবা তার ইচ্ছা বা ইংগিত ছাড়াই তার পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ করবে যা মূলত ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব ছিল কিন্তু সে নিজে তা আদায় করতে পারেনি। এ ব্যাপারে হানাফী ফিকাহবিদদের মত হলো ঃ ইবাদাত তিন প্রকার ঃ এক, নিরেট দৈহিক ইবাদাত, যেমন ঃ নামায। দুই, নিরেট আর্থিক ইবাদাত, যেমন ঃ যাকাত এবং তিন, দেহ ও অর্থের সমন্বিত ইবাদাত, যেমন ঃ হজ্জ। এসব ইবাদাতের মধ্যে প্রথম প্রকারের ইবাদাতে কোন রকম প্রতিনিধিত্ব চলে না। যেমন এক ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে আরেক ব্যক্তি নামায পড়তে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদাতে প্রতিনিধিত্ব চলতে পারে। যেমন ঃ স্বামী স্ত্রীর অলঙ্কারাদির যাকাত আদায় করতে পারে। তৃতীয় প্রকারের ইবাদাতে প্রতিনিধিত্ব কেবল তখনি চলতে পারে যখন মূল ব্যক্তি, যার পক্ষ থেকে কোন কাজ করা হচ্ছে, নিজের দায়িত্ব নিজে পালনে সাময়িকভাবে নয়, বরং স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে। যেমন, বদলি হজ্জ শুধু এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে পারে যে নিজে হজ্জ পালন করতে যেতে অক্ষম এবং কখনো হজ্জ পালনে যেতে সক্ষম হওয়ার আশাও করা যায় না। মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণও এ মতের সমর্থক। তবে বদলি হজ্জের জন্য ইমাম মালেক শর্ত আরোপ করেছেন যে, বাপ যদি ছেলেকে এ মর্মে অসীয়ত করে থাকে যে,

তার মৃত্যুর পর তার ছেলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে তাহলে তা জায়েজ হবে অন্যথায় নয়। তবে এ ব্যাপারে হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে বাপের ইংগিত বা অসীয়ত থাক বা না থাক—ছেলে তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পারে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খাস'আম গোত্রের এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো : আমার পিতার ওপর হজ্জের আদেশ এমন অবস্থায় প্রয়োজ্য হয়েছে যখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি উটের পিঠে বসে থাকতে পারেন না। নবী (সা) বললেন : فحجى عنه "তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ আদায় করো (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। হযরত আলীও (রা) প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হদীস বর্ণনা করেছেন।" (আহমাদ, তিরমিযী)।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) যুবায়ের খাস'আম গোত্রেরই একজন পুরুষের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সে ও তার বৃদ্ধ পিতা সম্পর্কে এ একই প্রশ্ন করেছিলো। নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমিই কি তার বড় ছেলে? সে বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন : ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه كان يجزى ذلك عنه তুমি কি মনে করো, যদি তোমার পিতা ঋণী থাকে আর তুমি তা আদায় করে দাও তাহলে তার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে? সে বললোঃ 'জি হাঁ'। তিনি বললেন, فاحجج عنه তাহলে অনুরূপভাবে তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জও আদায় করো। (আহমদ, নাসায়ী)

ইবনে আব্বাস বলেন : জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা এসে বললো : আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ আদায় করার আগেই তিনি মারা গেছেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন : তোমার মা যদি ঋণগ্রস্ত হতো তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে পারতে না? একইভাবে তোমরা আল্লাহর হকও আদায় করো। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার প্রদান করা সবচেয়ে বেশী জরুরী কাজ। (বুখারী, নাসায়ী) বুখারী ও মুসলিমের আরো একটি রেওয়ায়াত হচ্ছে, এক ব্যক্তি এসে তার বোন সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী (সা) তাকেও এ একই জবাব দিলেন।

এসব বর্ণনা থেকে অর্থ ও দেহের সমন্বিত ইবাদাতসমূহে প্রতিনিধিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর থাকে নিরেট দৈহিক ইবাদাতসমূহ। এ বিষয়ে এমন কিছু হাদীস আছে যা থেকে এ প্রকৃতির ইবাদাতসমূহের ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইবনে আব্বাসের (রা) এই বর্ণনা যে, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো : আমার মা রোযা মানত করেছিলেন। কিন্তু তা পূরণ করার পূর্বেই তিনি মারা গিয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারি? নবী (সা) বললেন : তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)। হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণিত এ হাদীস থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক মহিলা তার মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, তার ওপর এক মাসের (অথবা আরেকটি বর্ণনা অনুসারে দু' মাসের) রোযা ওয়াজিব ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে এ রোযা পালন করবো? নবী (সা) তাকেও অনুমতি দিলেন। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসেও নবী (সা) বলেছেন : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ কেউ যদি মারা যায় আর তাঁর

ওপর কিছু রোযা থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক সেই রোযা রাখবে (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ)। বাযযার বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) কথা উল্লেখিত হয়েছে এরূপ ঃ فليصم عنه وليه ان شاء অর্থাৎ তার অভিভাবক ইচ্ছা করলে তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে আসহাবুল হাদীস, ইমাম আওযায়ী এবং জাহেরিয়াগণ দৈহিক ইবাদাতসমূহেও প্রতিনিধিত্ব জায়েয হওয়ার সমর্থক। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম যায়েদ ইবনে আলীর ফতোয়া হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা যেতে পারে না। ইমাম আহমাদ, ইমাম লাইস এবং ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া বলেন ঃ এটা কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন মৃত ব্যক্তি তা মানত করেছে কিন্তু পূরণ করতে পারেনি। বিরোধীদের যুক্তি হলো, যেসব হাদীস থেকে এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার বর্ণনাকারীগণ নিজেরাই ঐ সব হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া দিয়েছেন। নাসায়ী ইবনে আব্বাসের ফতোয়া নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ لا يصل احد عن احد ولا يصم احد عن احد কোন ব্যক্তি যেন কারো পক্ষ থেকে নামায না পড়ে এবং রোযাও না রাখে। আবদুর রায্যাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশার ফতোয়া হলো ঃ لا تصوموا عن موتكم واطعموا عنهم "তোমাদের মৃতদের পক্ষ থেকে রোযা রেখো না, খাবার খাইয়ে দাও।" আবদুর রায্যাক আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকেও একথাই উদ্বৃত করেছেন, অর্থাৎ মৃতের পক্ষ থেকে যেন রোযা রাখা না হয়। এ থেকে জানা যায় যে, প্রথম প্রথম শারীরিক ইবাদাতসমূহেও প্রতিনিধিত্বের অনুমতি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থিরিকৃত হয় যে, এটা করা জায়েজ নয়। অন্যথায় কি করে সম্ভব যে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা নিজেরাই আবার তার পরিপন্থী ফতোয়া প্রদান করবেন?

এ ক্ষেত্রে একথা ভালভাবে বুঝতে হবে যে, প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে কোন ফরয পালন কেবল তাদের জন্যই উপকারী হতে পারে যারা নিজে ফরয আদায় করতে আগ্রহী কিন্তু বাস্তব কোন অসুবিধার কারণে অপারগ হয়ে পড়েছেন। তবে সমর্থ ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হজ্জ আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং এ ফরযটি আদায় করা সম্পর্কে তার মনে কোন অনুভূতি পর্যন্ত না থেকে থাকে তার জন্য বদলি হজ্জ যতই করা হোক না কেন তা তার জন্য কল্যাণকর হবে না। এটা ঠিক যেন কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যাক্তির ঋণের টাকা আত্মসাত করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকা। পরবর্তী সময়ে তার পক্ষ থেকে যদি প্রতিটি পাইও পরিশোধ করা হয় তবুও আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সে ঋণ আত্মসাতকারী ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হবে। অপরের আদায় করে দেয়ায় কেবল সেই ব্যক্তিই নিষ্কৃতি পেতে পারে যে তার জীবদ্দশায় ঋণ আদায়ে আগ্রহী ছিল। কিন্তু কোন অসুবিধার কারণে আদায় করতে পারেনি।

৩৯. অর্থাৎ আখেরাতে মানুষের কাজ-কর্মের যাঁচাই বাছাই হবে এবং কে কি কাজ করে এসেছে তা দেখা হবে। আয়াতের এ অংশটি যেহেতু পূর্ববর্তী অংশের পরপরই বলা হয়েছে তাই এ থেকে স্বতই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির সাথেই প্রথম অংশের সম্পর্ক। এ অংশকে যারা এ পৃথিবীর জন্য একটি অর্থনৈতিক মূলনীতি হিসেবে পেশ করে থাকে তাদের কথা ঠিক নয়। কুরআন মজীদের কোন আয়াতের এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যা পূর্বাপর প্রসংগের পরিপন্থী এবং কুরআনের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٣﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ
وَاَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾
وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٨﴾ وَاَنَّهٗ
هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾ وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَا ۨالْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾ وَثَمُوْدَا۟ فَمَآ اَبْقٰى ﴿٥١﴾

একথা যে, "শেষ পর্যন্ত তোমার রবের কাছেই পৌঁছতে হবে।"

একথা যে, "তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন।"[৪০]

একথা যে, "তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন।"

একথা যে, "তিনিই পুরুষ ও নারী রূপে জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"—এক ফোটা শুক্রের সাহায্যে যখন তা নিক্ষেপ করা হয়।"[৪১]

একথা যে, "পুনরায় জীবন দান করাও তাঁরই কাজ।"[৪২]

একথা যে, "তিনিই সম্পদশালী করেছেন এবং স্থায়ী সম্পদ দান করেছেন।"[৪৩]

একথা যে, "তিনিই শে'রার রব।"[৪৪]

আর একথাও যে, তিনিই প্রথম আদকে[৪৫] *ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করেছেন যে, কাউকে অবশিষ্ট রাখেননি।*

৪০. অর্থাৎ আনন্দ ও দুঃখের কার্যকারণ তার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভাল ও মন্দ ভাগ্যের মূলসূত্র তাঁরই হাতে। কারো ভাগ্যে যদি আরাম ও আনন্দ জুটে থাকে তাহলে তা তাঁর দানেই হয়েছে। আবার কেউ যদি বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়ে থাকে তাও তাঁর ইচ্ছায়ই হয়েছে। এ বিশ্ব-জাহানে এমন আর কোন সত্তা নেই ভাগ্যের ভাঙা গড়ায় যার কোন হাত আছে।

৪১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আর রূম, টীকা ২৭ থেকে ৩০; আশ শূরা, টীকা ৭৭।

৪২. ওপরের দু'টি আয়াতের সাথে এ আয়াতটি মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়, বাক্যের বিন্যাস থেকে আপনা আপনি মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। যে আল্লাহ মৃত্যু এবং জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন, যিনি একফোটা নগণ্য শুক্র দিয়ে মানুষের মত একটি সৃষ্টিকে তৈরী করেন, বরং সৃষ্টির একই উপাদান ও একই সৃষ্টির পদ্ধতি থেকে নারী ও পুরুষের দু'টি স্বতন্ত্র শ্রেণী সৃষ্টি করে দেখান, তার জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয়।

৪৩. মূল আয়াতে اقنى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা বলেন ঃ ইবনে আব্বাস এর অর্থ বলেছেন ارضى

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

তাদের পূর্বে তিনি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা আসলেই বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য লোক ছিল। তিনি উল্টে দেয়া জনপদকেও উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছেন। তারপর ঐগুলোকে আচ্ছাদিত করে দিল তাই যা (তোমরা জানো যে কি) আচ্ছাদিত করেছিলো।[৪৬]

তাই[৪৭], হে শ্রোতা, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে?[৪৮]

(সম্মত) করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস থেকে ইকরিমা এর অর্থ বর্ণনা করেছেন قنع (সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন)। ইমাম রাযী বলেন ঃ মানুষকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা–ই দেয়া হয়ে থাকে তাকেই اقناء বলে। আবু উবায়দা এবং আরো কিছু সংখ্যক ভাষাভিজ্ঞের মতে اقنى শব্দটির উদ্ভব قنية শব্দ থেকে। এর অর্থ অবশিষ্ট ও সংরক্ষিত থাকার মত সম্পদ। যেমন ঃ ঘর–বাড়ী, জমিজমা, বাগান, গবাদিপশু ইত্যাদি। ইবনে যায়েদ এসব অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন اقنى শব্দটি এখানে افقر (দরিদ্র করে দিয়েছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেছেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র বানিয়েছেন।

৪৪. শে'রা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আরবীতে একে مرزم الجوزاء، الكلب الاكبر، الكلب الجبار، الشعرى العبور প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইংরেজী ভাষায় একে Sirius, Dog star এবং Canis Majoris বলা হয়। এটি সূর্যের চেয়েও ২৩ গুণ বেশী উজ্জ্বল। কিন্তু পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব আট আলোকবর্ষেরও বেশী। তাই একে সূর্যের চেয়ে ছোট ও কম উজ্জ্বল দেখা যায়। মি রবাসীরা এর উপাসনা করতো। কারণ এর উদয়কালে নীল নদে জোয়ার ও প্লাবন হতো। সুতরাং তারা মনে করতো, এর উদয়ের প্রভাবেই এরূপ হয়েছে। জাহেলী যুগে আরবদেরও বিশ্বাস ছিল যে, এ নক্ষত্র মানুষের ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই কারণে এটি আরবদের উপাস্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিল এবং বিশেষ করে কুরাইশদের প্রতিবেশী খুজা'য়া গোত্র এর উপাসনার জন্য বিখ্যাত ছিল। আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, শে'রা নক্ষত্র তোমাদের ভাগ্য গড়ে না বরং তার রব গড়ে থাকেন।

৪৫. প্রথম আদ অর্থ প্রাচীন আদ জাতি যাদের কাছে হযরত হূদ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল। হযরত হূদকে (আ) অস্বীকার করার অপরাধে এ জাতি আল্লাহর আযাবের শিকার হলে যারা তার ওপর ঈমান এনেছিল কেবল তারাই রক্ষা পায়। এদের বংশধরদেরকে ইতিহাসে পরবর্তীকালের আদ বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়ে থাকে।

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿٦٢﴾

এটি একটি সাবধান বাণী—ইতিপূর্বে আগত সাবধান বাণীসমূহের মধ্য থেকে।[৪৯] আগমনকারী মুহূর্ত অতি সন্নিকটবর্তী হয়েছে।[৫০] আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার প্রতিরোধকারী নেই।[৫১] তাহলে কি এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছো?[৫২] হাসছো কিন্তু কাঁদছো না?[৫৩] আর গান-বাদ্য করে তা এড়িয়ে যাচ্ছো?[৫৪] আল্লাহর সামনে মাথা নত কর এবং তাঁর ইবাদাত করতে থাকো।[৫৫]

৪৬. উল্টিয়ে দেয়া জনপদসমূহ অর্থ লূতের কওমের জনপদসমূহ। আর "আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল তাদের ওপর যা কিছু আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো" অর্থ সম্ভবত মরু সাগরের পানি। তাদের জনপদসমূহ মাটিতে দেবে যাওয়ার পর এ সমুদ্রের পানি তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছিলো। আজ পর্যন্ত তা এ অঞ্চল প্লাবিত করে আছে।

৪৭. কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে একথাটিও ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহের একটি বাক্যাংশ। কিন্তু কোন কোন মুফাসসিরের মতে فغشاها ما غشى পর্যন্তই সহীফাসমূহের বাক্য শেষ হয়েছে এবং এখান থেকে অন্য বিষয় শুরু হচ্ছে। পরবর্তী কথার প্রতি লক্ষ করলে প্রথমোক্ত বক্তব্যই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তী এই বাক্য ঃ "এটি একটি সাবধান বাণী—ইতিপূর্বে আগত সাবধানবাণীসমূহের মধ্য থেকে' এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত করে যে, পূর্ববর্তী সবগুলো বাক্যই হযরত ইবরাহীম (আ) ও মূসার (আ) সহীফাসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। আর এগুলো সবই পূর্বেকার সাবধান বাণীসমূহের অন্তরভুক্ত।

৪৮. মূল আয়াতে تتمارى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ সন্দেহ পোষণ এবং ঝগড়া করা উভয়টিই। এখানে প্রত্যেক শ্রোতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। যে ব্যক্তিই এ বাণী শুনছে তাকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করা এবং তা নিয়ে নবী-রসূলদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার যে পরিণতি মানবেতিহাস দেখেছে তা সত্ত্বেও কি তুমি সেই নির্বুদ্ধিতার কাজ করবে? অতীত জাতিসমূহও তো এ একই সন্দেহ পোষণ করেছিলো যে, তারা এ পৃথিবীতে যেসব নিয়ামত ভোগ করছে তা একমাত্র আল্লাহর নিয়ামত না তা সরবরাহের কাজে অন্য কেউ শরীক আছে? অথবা এসব কারো সরবরাহকৃত নিয়ামত নয় বরং আপনা থেকেই পাওয়া গিয়েছে। এ সন্দেহের কারণেই তারা নবী-রসূলদের (আ) বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। নবী-রসূলগণ তাদের বলতেন, আল্লাহ এবং এক আল্লহই তোমাদেরকে এসব নিয়ামতের সবগুলো দান করেছেন। তাই তোমাদের উচিত তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁরই দাসত্ব করা। কিন্তু

তারা একথা মানতো না এবং এ বিষয়টি নিয়েই নবী–রসূলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতো। এখন কথা হলো, এসব জাতি তাদের এ সন্দেহ ও বিবাদের কি পরিণাম দেখেছে তাকি তুমি ইতিহাসে দেখতে পাও না? যে সন্দেহ–সংশয় ও বিবাদ অন্যদের জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে তুমিও কি সেই সন্দেহ–সংশয় ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে?

এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষ রাখতে হবে যে, আদ, সামূদ এবং নূহের কওমের লোকেরা হযরত ইবরাহীমের (আ) পূর্বে অতিবাহিত হয়েছিলো। এবং লূতের কওম হযরত ইবরাহীমের (আ) সময়েই আযাবে নিপতিত হয়েছিল। তাই এ বাক্যটি যে ইবরাহীমের সহীফার অংশ সে ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা নেই।

৪৯. মূল কথাটি হলো هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الاولـى । এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের তিনটি মত আছে। এক, نَذِير অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দুই, এর অর্থ কুরআন। তিন, এর অর্থ অতীতের ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিসমূহের পরিণতি যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বিষয়বস্তুর বিচারে আমাদের মতে এ তৃতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

৫০. অর্থাৎ একথা মনে করো না যে, চিন্তা–ভাবনা করার জন্য এখনো অনেক সময় আছে। তাই এসব কথা নিয়ে এখনই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার এবং অবিলম্বে এসব মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়ার প্রয়োজনটা কি? কিন্তু না; তোমাদের কেউ–ই জানে না তার জন্য জীবনের আর কতটা সময় এখনো আছে। যে কোন সময় তোমাদের যে কোন লোকের মৃত্যু এসে হাজির হতে পারে এবং অকস্মাত কিয়ামতও এসে পড়তে পারে। তাই চূড়ান্ত ফায়সালার মুহূর্তকে দূরে মনে করো না। যে ব্যক্তিই নিজের পরিণাম সম্পর্কে ভেবে দেখতে চায় সে যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে নিজেকে সংযত করে। কারণ, প্রতিবার শ্বাস গ্রহণের সাথে সাথে এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, দ্বিতীয়বার শ্বাস গ্রহণের আর কোন সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে না।

৫১. অর্থাৎ ফায়সালার সময় যখন এসে পড়বে তখন তোমরা না পারবে তা প্রতিরোধ করতে আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব উপাস্য আছে তাদের কারো এমন ক্ষমতাও নেই যে তা ঠেকাতে পারে। তা ঠেকোলে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলাই ঠেকাতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা ঠেকাবেন না।

৫২. মূল আয়াতে هـذا الحديث শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে কুরআন মজীদের আকারে যেসব শিক্ষা পেশ করা হচ্ছিলো এর দ্বারা সেই সব শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। আর বিস্ময় বলতে বুঝানো হয়েছে সেই বিস্ময়কে যা অভিনব ও অবিশ্বাস্য কথা শুনে মানুষ প্রকাশ করে থাকে। আয়াতটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন তা তো এসব কথাই যা তোমরা শুনেছো। তাহলে এগুলোই কি সেই সব কথা যা শুনে তোমরা কান খাড়া করে থাকো এবং বিস্ময়ের সাথে এমনভাবে মুখের দিকে তাকাতে থাকো যেন তোমাদেরকে কোন অদ্ভুত ও অভিনব কথা শুনানো হচ্ছে?

৫৩. অর্থাৎ নিজেদের মূর্খতা ও গোমরাহীর কারণে যেখানে তোমদের কান্না আসা দরকার সেখানে যে সত্য তোমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা নিয়ে তোমরা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছো।

৫৪. মূল আয়াতে سامدون শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাবিদগণ এ শব্দটির দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইকরিমা এবং আবু উবায়দা নাহবীর মতে سمود অর্থ গান বাদ্য করা। মক্কার কাফেররা কুরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করতে ও মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য জোরে জোরে গান বাদ্য শুরু করতো। এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও ইকরিমা এর আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে ঃ

السمود البرطمة وهى رفع الراس تكبرا ، كانوا يمرون على النبى صلى الله عليه وسلم غضابا مبرطمين -

"অহংকার ভরে ঘাড় উঁচু বা বাঁকা করা। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্রোধে ঘাড় উঁচু করে চলে যেতো।"

রাগেব ইস্পাহানী তার 'মুফরাদাত' গ্রন্থে এ অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। এ অর্থ বিবেচনা করে কাতাদা سامدون শব্দের অর্থ করেছেন غافلون এবং সায়ীদ ইবনে জুবাইর অর্থ করেছেন معرضون ।

৫৫. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেমের মতে এ আয়াত পাঠ করে সিজদা করা অবশ্য কর্তব্য। ইমাম মালেক এ আয়াত তিলাওয়াত করে যদিও সব–সময় সিজদা করতেন (যেমন কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন) কিন্তু এখানে সিজদা করা জরুরী নয় বলে তিনি মত পোষণ করতেন। তাঁর এ মতের ভিত্তি যায়েদ ইবনে সাবেতের এই বর্ণনা যে, "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সূরা নাজ্‌ম পাঠ করলে তিনি সিজদা করেননি।" (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)। কিন্তু উক্ত হাদীসটি এ আয়াত পাঠ করে সিজদা করার বাধ্যবাধকতা রহিত করে না। কারণ এ ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, কোন কারণে নবী (সা) সে সময় সিজদা করেননি কিন্তু পরে করেছেন। এ বিষয়ে অন্য সব রেওয়ায়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, এ আয়াত পাঠ করে সব সময় অবশ্যই সিজদা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও মুত্তালিব (রা) ইবনে আবী ওয়াদা'আর সর্বসম্মত বর্ণনাসমূহ হচ্ছে, নবী (সা) সর্বপ্রথম যখন হারাম শরীফে তিলাওয়াত করেন তখন তিনি সিজদা করেছিলেন। সে সময় মুসলমান ও কাফের সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে গিয়েছিলো।" (বুখারী, আহমাদ, নাসায়ী)। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, "নবী (সা) নামাযে সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় থেকেছেন।" (বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া)। সাবুরাতুল জুহানী বলেন ঃ হযরত উমর (রা) ফজরের নামাযে সূরা নাজ্‌ম পড়ে সিজদা করেছেন এবং তারপর উঠে সূরা যিলযাল পড়ে রুকূ' করেছেন।" (সা'য়ীদ ইবনে মানসুর)। ইমাম মালেক নিজেও মুয়াত্তা গ্রন্থের ما جاء فى سجود القران অনুচ্ছেদে হযরত উমরের এ আমলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।